সাহিত্য-ভারতী

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Test Book for Class VII Vide Notification T. B. No. VII/B/76/169 Dt, 29.11.77

সাহিত্য-ভারতী

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

মানিকলাল মিত্র, এম. এ, বি, এড্

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক,

কলিন্স ইনস্টিটিউট, কলিকাতা ।

ও

অমলেন্দু ঘোষ বি, এ, (অনার্স) বি, টি,

তালদি মোহনচাঁদ বহুমুখী বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও

সাহিত্যের অন্যতম শিক্ষক ।

৩৯/৪, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা–৭০০০০৬ ।

প্রকাশক :
বুক নিউজ
৩৯।৪, রামতনু বোস লেন
কলিকাতা—১০০ ০০৬।

মূল্য : ৪·০০

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :
ভারতী গ্রন্থাগার
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২

মুদ্রক :
শ্রীতারা প্রেস
৩৯।৪, রামতনু বোস লেন
কলিকাতা—৬।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



পিতৃদেব

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্যকে একটি শিল্পসম্মতরূপ দান করেন। তাঁহার সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙলাসাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করে। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। এই অংশটি তাঁহার আত্মজীবনী 'বিদ্যাসাগর চরিত' হইতে লওয়া হইয়াছে।]

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না, সুতরাং, তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি দিনদিন, শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন একদিন তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছে, কেন? তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার

ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যায় পর নাই, আহ্লাদিত হইলেন, এবং পরদিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিলনা। তিনি দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া ঠাকুরদাসের, নির্বিঘ্নে দুইবেলা আহার ও ইঙ্গরেজী শিক্ষা চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয় দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব হইয়া গেল; সুতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতিদিন প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনওদিন দেড় প্রহরের কোনওদিন দুই প্রহরের, কোনদিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনদিন বা স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না, সেই সেই, দিন ঠাকুরদাসকে, সমস্তদিন, উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার শালপাতা কিনিয়া রাখিলে, ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক, সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আটকাইবেক না; অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায়

আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন, কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া, কখনও কখনও, বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব, আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন, মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড় বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবানারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন ; ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মূড়কিগুলি খাইলেন,

তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন না, মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইওনা, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাস-বাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

অনুশীলনী

১। ঠাকুরদাসের ইংরাজী শিক্ষার অসুবিধা কি ছিল? কিভাবে তাহা দূর হইল?

২। কোন্ ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রের মনে দুঃসহ দুঃখানল ও স্ত্রীজাতির প্রতি গভীর ভক্তি জন্মিয়াছিল? ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। "আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিবনা।"

—'আমরা' বলিতে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? কে পুরাণ বাসন বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহার বাসন বিক্রয়ের কী উদ্দেশ্য ছিল? অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিবার অসুবিধা কি?

৪। এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।

(ক) —কোন্ রচনা হইতে এই অংশটি লওয়া হইয়াছে?

(খ) —কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে?

গ) —ইহার মর্মার্থ লিখ।

৫। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) পিতৃদেব রচনার লেখক কে? গ) তাঁহার পিতার নাম কি? গ) ঠাকুরদাস কোথায় রাত্রিকালীন আহার করিতেন? ঘ) কাহার বাটীতে ঠাকুরদাস রাঁধিয়া খাইবার সুযোগ পাইলেন? ঙ) তিনি তাঁহার পিতলের থালা ও ঘটী বেচিতে গেলেন কেন? চ) ঠাকুরদাস কেন বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত পথ হাঁটিয়া ছিলেন? ছ) কোন্ দোকানের সামনে তিনি কেন দাঁড়াইয়া ছিলেন? জ) দোকানী স্ত্রীলোকটি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? ঝ) পিতা ঠাকুরদাসের মুখে স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল?

৬। অর্থ লিখ: নক্তন্তন, নিরীক্ষণ, হৃদয়বিদারণ, বাৎসল্য।

৭ সন্ধি বিচ্ছেদ কর: নির্বিঘ্নে, দুর্ভাগ্য, পানার্থে উপাখ্যান, দুঃখানল।

ঠাকুরদাসের একাগ্রতা, শ্রমনিষ্ঠা, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

আলেয়া

অক্ষয় কুমার দত্ত

[অক্ষয় কুমার দত্ত একজন চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখক ছিলেন। রচনাটি তাঁহার 'চারুপাঠ' হইতে উদ্ধৃত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রূপে রচনাটি গৃহীত হইয়াছে। আলেয়ার সম্পর্কে আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা এক ধরণের জলীয় গ্যাস লেখক এই প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।]

রাত্রিকালে জলাভূমিতে ও সমাধিক্ষেত্রে সচরাচর যে আলোকময় বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই লোকে আলেয়া কহে। এ আলোক অতি চঞ্চল। ভূতল হইতে এক বা দেড় হস্ত ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করে। কখন ঊর্ধ্বগামী, কখনও বা অধোগামী হয়; কখন কখন সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং পুনরায় তৎক্ষণাৎ অন্যস্থানে আবির্ভূত হইয়া উঠে। কখন কখন স্ফীত হইয়া মশালের মত জ্বলিয়া উঠে, আবার সঙ্কুচিত হইয়া দীপশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে।

এক একবার বিভক্ত হইয়া দুই খণ্ড হয়; পুর্ণবার মিলিত হইয়া পূর্ববৎ একত্র হয়। উহা জলে নির্বাণ পায় না। বৃষ্টিপাত ও তুষার পাতের সময়েও আবির্ভূত হয়।

কোন ব্যক্তি আলেয়ার নিকটবর্তী হইলে তাহার পদসঞ্চারে তত্রত্য বায়ু কম্পিত হইয়া উহাকে বিচলিত ও স্থানান্তরিত করে। অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের এ বিষয়ে এরূপ কুসংস্কার আছে যে, আলেয়া এক প্রকারের ভূতযোনি। তাহারা প্রান্তরে ও তাদৃশ জনশূন্য স্থানে অবস্থিতি করে, সুযোগ পাইলে রাত্রিকালে পথিকদিগের পথভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। ইহা পূর্বোক্ত প্রকারে কম্পিত ও সঞ্চারিত হইলে তাহারা মনে করে, আলেয়ারা বুঝি জানিয়া শুনিয়াই ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতেই তাহাদিগের কুসংস্কার-সংযুক্ত অন্তঃকরণে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে।

অগ্নি ব্যতিরেকে যে আলোক উৎপাদিত হইতে পারে ইহা খদ্যোতিকা ও দীপমক্ষিকা প্রভৃতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অনায়াসে জানিতে পারা যায়। আলেয়াও একপ্রকার সেইরূপ আলোক। ইহা ফস্ফোরস হায়ড্রজন নামক পদার্থঘটিত এইরূপ বাষ্প ব্যতীত আর কিছু নহে।

জীবজন্তুর শরীর ও বৃক্ষাদি পচিলে, তাহা হইতে ঐ বাষ্প উৎপন্ন হয়। ঐ বাষ্পের এইরূপ আশ্চর্য গুণ যে, বায়ু সংলগ্ন হইলে, উহা আপনা হইতে দীপ্তিমান হইয়া উঠে।

অনুশীলনী

১। আলেয়া জিনিসটি কি বুঝাইয়া বল।

২। অগ্নি ব্যাতিরেকে আলোক উৎপাদিত হয় কি না? ঐ শ্রেণীর আলোকের দুই-একটি উদাহরণ দাও।

৩। আলেয়া কোথায় কখন দেখা যায় ? উহা দেখিতে কিরূপ ?

৪। আলেয়ার আলো কিরূপে সৃষ্ট হইয়া থাকে ?

৫। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) আলেয়া কাহাকে বলে ? খ) কোন্ ব্যক্তি আলেয়ার নিকটবর্তী হইলে সেখানে কি অবস্থা ঘটে ? গ) অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকেরা আলেয়াকে কি মনে করিয়া থাকে ? ঘ) কোন্ কোন্ বাষ্প দ্বারা আলেয়ার আলোক সৃষ্টি হয় ?

বিজ্ঞান-বীক্ষা ও কুসংস্কারে অবিশ্বাস



যাত্রাদলে মুচিরাম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভা। বাঙলা উপন্যাসের তিনি প্রথম সার্থক স্রষ্টা। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। প্রবন্ধ সাহিত্য ও রস রচনায়ও তিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য অংশটি 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' হইতে লওয়া হইয়াছে।]

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটি বারোয়ারী পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোয়ারী কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিনদিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিনরাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথমদিন যাত্রা শুনিয়া বহু যত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুস্করিণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন। ...... তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে ?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের

ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু ভাল নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে —আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্নজুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলে? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে' ভাল থাকিবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিতে না। অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারারীর হস্তে সমর্পণ করিল।

মুচিরাম অল্পদিনেই জানিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এগ্রাম ওগ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল। অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুচিরামের সোনার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না।...

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকে বলিতে হইবে, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতকদূর বলিল "মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে"—সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল, "গুড়ক খাও—" শুনিয়া মুচিরাম বলিল, "রাধে—একবার বদন তুলে গুড়ক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের—যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী সাজ ঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তর লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। ...অধিকারী মুচিরামের সন্ধান করিয়া না পাইয়া, সাজঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন রহিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারী মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? ....অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রি জাগরণ—দেবালয়বরণ্ডে সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারী বামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন

প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে, দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল, যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পালাইলাম। আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না।

অনুশীলনী

১। মুচিরাম কোন্ কোন্ কারণে যাত্রাদলে যোগ দিবার সুযোগ পাইল?

২। যাত্রাদলে যোগদানের পর তাহার মনের অবস্থা কি কারণে বিরূপ হইয়াছিল?

৩। কোন্ ঘটনায় মুচিরাম যাত্রাদল হইতে গভীর রাত্রিতে পলায়ন করে? যাত্রার দল চলিয়া গেলে সে পুনরায় তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কেন?

৪। ব্যাখ্যা কর:

(ক) যাত্রাওয়ালা কেবল ······করিয়া বেড়ায় না।

(খ) অল্পদিনেই মুচিরামের······পরিণত হইল।

(গ) যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল—··· মার খাইলাম না।

৫। অর্থ লিখ:

বারোয়ারী, সুকণ্ঠ, প্রক্ষালন, বিধাতা, সমর্পণ, বাষ্পরাশি, ভঞ্জন, গুড়ুক, অধিকারী, সাপটিয়া, পৃষ্ঠদেশে, অবতীর্ণ, নিষ্ক্রান্ত, অন্তর্হিত।

৬। মৌখিক উত্তর দাও:

(ক) মুচিরাম কত বছর বয়সে যাত্রার দলে যোগ দেয়?

(খ) তাহার মাতা প্রথমে ছেলেকে যাত্রার দলে যোগদানে বাধা দিয়াছিল কেন?

(গ) যাত্রার দল সম্পর্কে মুচিরামের প্রথমে কী ধারণা ছিল?

(ঘ) পরে যাত্রার দল সম্পর্কে তাহার কী ধারণা হয়?

(ঙ) অধিকারী বেত হাতে সাজঘরে ঢুকিয়া মুচিরামকে প্রহার করিতে গিয়াছিল কেন?

(চ) মুচিরাম এই প্রহার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কী করিয়াছিল?

(ছ) অধিকারীর মুচিরামকে না খুঁজিবার কারণ কী?

(জ) যাত্রাদল হইতে পলায়ন করিয়া মুচিরাম কোথায় আশ্রয় লইয়াছিল?



পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শিবনাথ শাস্ত্রী

[শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। সে আমলে তিনি বাংলা গদ্যরচনায় নব যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম শিবনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্পর্কে এই লেখাটিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। খৃষ্টধর্মের সম্পর্কে পরমপুরুষের অভিমতও রচনাটিতে পাওয়া যায়।]

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক- রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা। রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বল রূপেই স্মরণে আছে। একবার আমি দাক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খৃষ্টীয় পাদরী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গেলাম। তিনি আমর মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন।

আমি গিয়া যে-ই বলিলাম, 'মশায়, ইনি আমার একটি খৃষ্টান বন্ধু. আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা ছোঁয়াইয়া বলিলেন— 'যীশুখৃষ্টের চরণে শতশত প্রণাম।'

আমার খৃষ্টান বন্ধুটি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?"

উত্তর— 'কেন, ঈশ্বরের অবতার।"

খৃষ্টান বন্ধুটি বলিলেন—"ঈশ্বরের অবতার কি রূপ? কৃষ্ণাদির মত?"

রামকৃষ্ণ—"হ্যাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য,—যীশুও এক-অবতার।"

খৃষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বুঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জানো? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোনো বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল—ধরবার-ছোঁয়ার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোনো বিশেষ কারণে কোন এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশীশক্তি মূর্তি ধারণ করলে ধরবার-ছোঁয়ার মত হলো।

যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যা কিছু শক্তি তা ঐশীশক্তি তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

অনুশীলনী

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে কি জান? তাঁহার ধর্মমত কিরূপ ছিল?

২। খৃষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কি লইয়া আলোচনা হইয়াছিল?

৩। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য আসিয়া লেখকের কি মনে হইয়াছিল?

৪। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) কে কাহাকে সঙ্গে লইয়া পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন?

খ) পরমহংসদেব কে ছিলেন? গ) যীশুখৃষ্ট কে ছিলেন? তাঁহার জীবনে কোন্ বিশেষ শক্তি বিরাজমান ছিল?

৫। শব্দার্থ: ঐশীশক্তি, সার্বভৌমিকতা, বিশ্বব্যাপ্তি, ঈশ্বরের শক্তি।

ধর্মীয় উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা



ঈশ্বর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ অঃ তিনি নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্বভারতী তাঁহার মহৎ কীর্তি, নিম্নের কাহিনী কবির 'জীবনস্মৃতি' নামক গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে।]

আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই মনে আছে—তাহার বেশী আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংগত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটি-জলের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদবেগে ঘটী ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন-চারহাত নিচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের

জল কাটাইতে, কাটাইতে, অবশেষে হঠাৎ একসময় দ্রুত গতিতে ডুব দিয়া লইত, যেন পুষ্করিণীটাকে কোনমতে, অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহার শরীরের কাপড় চোপড়গুলোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলেস্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেইগুলোকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্বজগৎটা কোনোদিক দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে, সে বরানগরকে বরাহনগর বলে।

এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার, জন্য একটি উপায় বাহিক করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙাসেজের চারিদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়ি-কাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত টিক্‌টিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশ-লবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা

নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে।...

কোনো-কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্র-ঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোট ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরুসভায় ভীষ্ম পিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশী প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলেও, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে দুই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে বর মানুষ আদায় করিয়া লয়, সেই বরের মতো, লুচি কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেশন কর্তার কুন্ঠিত

দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা হইত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিস ফরমাশ করিলে সে খুশি হইবে। কখনো মুড়ি, প্রভৃতি লঘুপথ্য, কখনো বা ছোলাসিদ্ধ, চিনাবাদাম ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচার-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

অনুশীলনী

১। ঈশ্বর কে? সে কি প্রকৃতির লোক ছিল সংক্ষেপে লিখ।

২। ঈশ্বর কিরূপে বালকদিগকে সংযত রাখিত?

৩। "আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল।"—পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটি কে? তাহার দুর্বলতাগুলি কি কি? কে কোন্ প্রসঙ্গে কথাটির উত্থাপন করিয়াছেন?

৪। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন:

ক) জলেস্থলে আকাশে এবং………… বিষম সাধনা ছিল।

—কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মূল অর্থ লিখ।

খ) বিশ্ব জগৎটা ………… তাহার পক্ষে অসহ্য।

—কে কোন্ রচনায় এই কথা বলিয়াছেন? ইহার প্রসঙ্গ কি ছিল? মূল ভাবটি লিখ।

গ) যেদিন কুশলবের………… দিতে প্রবৃত্ত হইল।

—বক্তা কে? ইহা কোন্ রচনার অন্তর্গত? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মূল ভাবটি কি?

ঘ) তবু কুরুসভায় ভীষ্ম পিতামহের……অবিচলিত রাখিয়াছিল।

কোন্ রচনায় এই পংক্তিটি রহিয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মূল ভাবটি লিখ।

৫। "এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল।"—এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় কে? 'আমাদিগকে' বলিতে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? তাহাদের সংযত রাখিতে গুরুমহাশয় কোন্ উপায়টি বাহির করিয়াছিল?

৬। বাক্যাংশের আলোচনামূলক প্রশ্ন:

ক) "সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত।" – কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতাদের নাম লিখ।

খ) "পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্র ঘটিত তর্ক উঠিত।" —কোন রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? পুরাণ কী?

গ) "তবু কুরুসভায় ভীষ্ম পিতামহের মতো…………অবিচলিত রাখিয়াছিল।"– কোন্ রচনা হইতে লওয়া হইয়াছে? ভীষ্ম কে?

৭। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) ঈশ্বর রচনাটির লেখক কে খ) এই রচনাটি কোন্ গ্রন্থ হইতে সংকলিত? গ) ঈশ্বর কাহার নাম? ঘ) সে কিরূপে শিশুদের সন্ধ্যায় সংযত রাখিত? ঙ) তাহার বিশেষ দুর্বলতাটি কি? চ) শিশুদের জলখাবার দেওয়ার ব্যাপারে আচরণ কিরূপ ছিল? ছ) কাহারা কাহাকে অপথ্য কিনিতে আদেশ করিত এবং কেন?

৮। অর্থ লিখ: আচারনিষ্ঠ, অসদ্ভাব, মলিনতা, অহোরাত্র, অতল-স্পর্শ, ভূতপূর্ব, দরবেশ, বিকর্ষণ।

বাল্যস্মৃতি

প্রতাপের মতিপরিবর্তন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



[দেশপ্রেমিক কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার স্বদেশী গানগুলির জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। সে আমলে দেশভক্তিমূলক নাটকগুলির মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী ও স্বজাতির প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'প্রতাপের মতি পরিবর্তন' নামক নাট্যাংশটি তাঁহার 'প্রতাপ সিংহ, নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য হইতে গৃহীত। রানা প্রতাপ মোগলের কাছে সহায়হীনতা ও অর্থাভাবে বশ্যতা স্বীকার করিবার মনস্থ করেন। সেই সময় একই সংগে তিনি সহায় শক্তসিংহ এবং ভীম সাহার সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন।]

গোবিন্দ—রানা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে আগ্রানগরে মহোৎসব হয়ে গেছে। গৃহে গৃহে নহবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল, প্রতি সৌধচূড়ায় রঞ্জিত পতাকা উড়েছিল, রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! তা রানার পক্ষে সম্মানের কথা।

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন—সম্মানের কথা বটে!

গোবিন্দ—সম্রাট রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে আসন নির্দ্দেশ করেছেন।

প্রতাপ—সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

(এই সময়ে সেই গুহায় শক্তসিংহ প্রবেশ করিলেন)

শক্ত—কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ—কে ? শক্ত ?

শক্ত—হ্যাঁ দাদা আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসেছি।

প্রতাপ—আর প্রয়োজন নেই, শক্ত! আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত—তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ, দাদা ?

প্রতাপ—হ্যাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। যাক্ মেবার, যাক্ চিতোর, যাক্ কমলমীর।

শক্ত—পৃথিবী হাসবে।

প্রতাপ—হাসুক।

শক্ত—মাড়বার, চান্দেরী হাসবে।

প্রতাপ—হাসুক্।

শক্ত—মানসিংহ হাসবে।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ উত্তর করিলেন,—"হাসুক্। কি কর্‌ব।"

শক্ত—দাদা, তোমার মুখে একথা শুনবো যে,তা'স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ—কি করব ভাই। চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত—আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের দুর্দিন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আসবে। আমি তার সূচনা ক'রে এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন ? শক্ত আবার কহিলেন—জান দাদা, এখানে আবার আগে আমি ফিন্‌শরার দুর্গ জয় করে এসেছি ?

প্রতাপ—তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে ?

শক্ত—সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি, চীৎকার করে বলতে বলতে এসেছি যে, "আমি প্রতাপ সিংহের ভাই

শক্তসিংহ ; যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে।—কে আসবে এসো।" —তা' শুনে বাড়ির গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো ; পিতা ছেলে ছেড়ে এলো ; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো ; রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধরলে ; কুব্জ সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো !—দাদা ! তোমার নামে যে কি যাদু আছে, তা তুমি জান না। আমি জানি।

(ভীমসাহা ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী—কৈ রানা প্রতাপ ?

প্রতাপ—কে ? পৃথ্বীরাজ। তুমি এখানে।

পৃথ্বী—প্রতাপ সিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো ?

প্রতাপ হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী—হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান ! শেষে প্রতাপসিংহও তোমাকে পরিত্যাগ করলে।—প্রতাপ ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি ; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল যে, প্রতাপের গৌরব করতে পারতাম। বলতে পারতাম, এই সার্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয়নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ পৃথ্বী। লজ্জা করে না যে, তুমি তোমার ভাই বিকানীর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান করবে, আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় এক আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জন করে তোমাদের গৌরব করবার আদর্শ যোগাবো ?

পৃথ্বী—হাঁ প্রতাপ ! অধম ভালুককে যাদুকর নাচায় ; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জন গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক, কিন্তু সূর্য

এক! শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্বত গর্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে থাকে।

সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়েই থাকে। মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নতুন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে; নীরন্ধ্র কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্তি প্রথিত করে!

তুমি সেই সন্ন্যাসী। প্রতাপ, তুমিও মাথা হেঁট করবে?

প্রতাপ—কি করব? আমার যে কিছুই নেই! আমি একা কি করব? আমার সৈন্য নেই। পাঁচজন সৈন্যও নেই।

শক্ত—আমি নতুন সৈন্য সংগ্রহ করব।

প্রতাপ—যদি অর্থ থাকতো, তা'হলে আবার নতুন সেনাদল গঠন করতে পারতাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, অর্থ নেই।

ভীম সাহা—অর্থ আছে রানা!

প্রতাপ—কি বলছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়? মন্ত্রী। তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দকও নেই।

ভীম সাহা—সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ—বৃদ্ধ! তুমি বাতুল—না উন্মাদ? কোথায় অর্থ?

ভীম সাহা—রানা! চিতোরের সুদিনে আমার পূর্বপুরুষেরা রানার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয়তো আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ—প্রভূত অর্থ! কত?

ভীম সাহা—আশ্চর্য হবেন না রানা। অর্থ চৌদ্দবর্ষ ধরে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ—মন্ত্রী, তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি। কিন্তু মেবারের রানার এ নিয়ম নয় যে, ভৃত্যে অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে। তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ করতে, তুমি ভোগ কর।

ভীম সাহা—প্রভু! এমন দিন আসে, যখন ভৃত্যের নিকটে গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমানকর নয়। আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দু নারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? রানা! আমি পূর্বপুরুষের ও আমার আজন্ম অর্জিত ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নয়, তোমার হস্তে দিচ্ছি এই বলিয়া জানু পাতিলেন।

শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন—"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা।"

প্রতাপ—তবে তাই হোক্। এ দান আমি নেবো।

অনুশীলনী

১। রানা প্রতাপের মতি পরিবর্তন কেন হইয়াছিল? কেন তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন?

২। মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়া পুনরায় কেন তাঁহার মতির পরিবর্তন ঘটিল?

৩। শক্তসিংহ কে? শক্তসিংহের সংগে রানা প্রতাপের পুনর্মিলন কি করিয়া হইল?

৪। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

ক) "অধম ভালুকে যাদুকর……গরিমায় বাস করে"।

—কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মূল অর্থ কি?

খ) "শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে,……শির উন্নত করে থাকে।"

—কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়াছেন? ইহার অর্থ কি?

গ) "অত্যাচারীর………উজ্জ্বল করে"।

- কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসংগে কে এই কথা বলিয়াছেন? এই কথার অর্থ কি?

৫। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) 'প্রতাপের মতি পরিবর্তন' নাট্যাংশের লেখকের নাম কি? খ) তাঁহার কোন্ নাটক হইতে ইহা সংকলিত হইয়াছে? গ) শক্তসিংহ প্রতাপের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ করেন? ঘ) সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কোন্ দুর্গ জয় করেন? ঙ) তিনি দুর্গ জয়ের জন্য কীভাবে সৈন্য সংগ্রহ করেন? চ) ভীম সাহা রানাকে কীভাবে সাহায্য করিতে চাহিলেন? ছ) রানা প্রথমে সেই সাহায্য গ্রহণ করিতে চাহেন নাই কেন?

৬। শব্দার্থ লিখ :

নহবৎ, সৌধ, উচ্ছন্ন, শির, স্তুতিগান, কেশরী, গহনে, গরিমায়, উত্তুঙ্গ বিলাস, অনশনে, বিকীর্ণ, নীরন্ধ্র, লেলিহান, কীর্তি, প্রথিত, কপর্দক, প্রভূত, লাঞ্ছিত।

দেশাত্মবোধ ও প্রভুভক্তি

হীরা-কুনি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বাংলাসাহিত্যের দক্ষ রূপকার অবনীন্দ্রনাথের লেখনীতে অঙ্কিত একটি সুন্দর গল্প। তাঁহার সহজ সরল গদ্য ভাষার নিদর্শন এই গল্পটিতে পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পগুরু নামে জগৎ বিখ্যাত, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।]

গোয়ালিনীর নাম 'হীরা' গাইটির নাম কুনি। হীরার একটি একমাসের ছেলে, গাইটির একটি একমাসের বাছুর।

হীরা দুধ বেচ্‌তে চলে রায়গড়ের পাহাড় ভেঙ্গে বর্গীরাজাকে। কুনি-গাইয়ের টাট্‌কা দুধ রাজা খায়, বাছুরটি কাঁদতে থাকে। হীরার মনে কোনদিন ব্যথা বাজে না বাছুরের জন্যে। দুধ দুইবার বেলায় কুনি-গাই থেকে থেকে বাছুরকে ডাকে, বাছুর ছুটে আসতে চায় দুধ খেতে হীরা তাকে ফিরিয়ে দেয়, খোঁটায় বেঁধে রাখে। বাছুর তার মাকে পায় না, কাঁদতে থাকে দুধের জন্যে। হীরা সেদিকে নজরই দেয় না, সকাল-বিকাল দুধ দুয়ে নিয়ে যায় বেচ্‌তে বর্গীর কেল্লায়, সেখান থেকে ফিরে আসে সন্ধ্যার আগে। প্রথমে নিজের ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায় তারপর বাছুরকে নিয়ে কুনির কাছে ধরে, বাছুর তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু দুধ পায় একটুখানি। কুনি বাছুরের গা চেটে তাকে ঘুম পাড়ায়। বাছুর থাকে উপবাসী, দুধ খায় বর্গীরাজা। এইভাবে দিন যায়।

একদিন হীরা গেল দুধ বেচ্‌তে কেল্লায়, সেখানে দুধের দাম চোকাতে রাজার খাজাঞ্চিও কর্‌লে দেরি. সন্ধ্যায় ঘড়ি পড়লো. কেল্লার ফটক ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। হীরা বল্‌লে—"দোর খোল।" সেপাই বল্‌লে-"হুকুম নেই!" হীরার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে ছেলের জন্যে। সে কেঁদে বলে—"বাছা আমার, না খেয়ে রয়েছে, পায়ে ধরি দোর খোল।" বর্গীরাজার কড়া পাহারা, দোর খোলে না।

হীরার বুক টন্‌টন্‌ করে ছেলেকে দুধ দিতে সে দোরের শিকল নিয়ে নাড়া দেয়, বলে—"একটিবার খোল রে খিল!" লোহার তালা ঝন্‌ঝন্‌ করে জানায়—হুকুম নেই।

বেলা পড়লো, সন্ধ্যাতারা কেল্লার মাঝখানে দেবতার মন্দিরের ঠিক উপরে দেখা দিল, রাতের পাখিরা ডানা মেলে উড়ে চল্‌ল বাসায়, হীরা কেঁদে বল্‌লে—"ওরে ডানা পাই তো উড়ে যাই বাচার কাছে—সে যে না খেয়ে মরে!" পাহাড়ের নীচেই হীরার ঘর সেখান থেকে কুনি গাই তার বাছুরকে ডাক দিচ্ছে শোনা গেল। হীরা দুধের খালি কলসী আছড়ে ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, কোমর বেঁধে পথের সন্ধানে চল্‌ল।

রায়গরের পুরানো বুরুজ, তারি ধারে পাহাড় খানিক ধ্বসে গেছে একটা অশ্বত্থগাছ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে সেইখানটায় অর্ধেক রাতে চাঁদের আলো পড়্‌লো। হীরা দেখ্‌লে, পাথরগুলো কুমীরের দাঁতের মত খোঁচা-খোঁচা ঝক্‌-ঝক্‌ করছে। একটির পর একটি পাথরে পা রেখে, তারপর একটা পাকদণ্ডি বেয়ে হীরা নেমে গেল আপনার ঘরে। তখন রাত ফুরিয়ে সকাল হচ্ছে—ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে। হীরা ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে দুধ দিতে লাগ্‌লো—দড়ি ছিঁড়ে

কুনির উপবাসী বাছুর দুধ খেতে থাকলো; হীরা সেদিন তাকে বাঁধলে না, তার মার কাছ থেকে সরিয়ে দিলে না।

বেলা হলো রায়গড়ের বর্গীরাজা ঘুম ভেঙ্গে দুধের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলেন। হীরা আজ দুধ আনেনি। সেপাই ছুট্‌লো, শাস্ত্রী ছুট্‌লো হীরার ঘরে দুধ আনতে, হীরা বললে—"দুধ নেই, শুকিয়ে গেছে।" বর্গীরাজ সেপাই সে, শুনবে কেন? হীরাকে ধরে নিয়ে গেল কেল্লায়। সেখানে রাজা শুন্‌লেন সব কথা, হীরাকে তার গ্রামখানা জায়গীর দিলেন—আর যে পথে হীরা প্রাণ হাতে করে নেমে গিয়েছিল ছেলের কাছে, সেই দুর্গম পথটার নাম দিলেন বর্গীরাজা, 'হীরা-কুনি'।

হীরা দুধ বেচা ছেড়ে চাষবাসের কাজে লেগে গেল।

অনুশীলন

১। হীরা, কুনি, আর হীরা-কুনি এই তিনটি নাম বলিতে কি বুঝাইতেছে?

২। হীরা কি করিয়া পাহাড়িয়া কেল্লা হইতে সমতলে নামিল?

৩। হীরা তাহার দুঃসাহসের কি পুরস্কার পাইল?

৪। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) হীরা কোথায় দুধ বেচিতে যাইত? খ) কুনির বাছুর উপবাসী থাকিত কেন? গ) হীরা কোথায় কিভাবে আটকা পড়িয়াছিল? ঘ) নিজের ঘরে ফিরিয়া হীরা প্রথমে কী করিল? ঙ) কুনির বাছুরটি তখন কী করিতেছিল? চ) হীরা দুধ বেচা ছাড়িয়া দিল কেন?

৫। অর্থসহ বাক্য রচনা কর: খাজাঞ্চি, বুরুজ, জায়গীর।

মাতৃস্নেহ



নতুনদা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। প্রথম জীবনে তিনি সুদূর ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে যান। পরে সাহিত্যসাধনাকেই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেন। পথের দাবী, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। 'নতুনদা' অংশটি তাঁহার শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্ব হইতে লওয়া হইয়াছে।]

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব একপশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায় শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে ছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, চারিদিকে জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, থিয়েটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ী আয়। পাঁচমিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম উহাদের বাড়ীর গাড়ি করিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ী।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয় তো বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে, দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি নিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভার কোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি-পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত যাচ্ছেতাই বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কিরে ?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায় ? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক।

Class distinction and elitism (A)

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এম্‌নি বিকটভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রের মাসতুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল, এ পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন-মুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত তোর গায়ে ওটা কালাপানা কি রে ? র‍্যাপার ? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী ? তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি!

আমি দিচ্চি. নতুন দা। আমার শীত করচে না—এই নাও; বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙ্গি ওপারে গিয়া ভিড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুস্কিল হ'ল! হাওয়া পড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।

কলিকাতাবাসী নতুন দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই রেষ ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আন্‌লি কেন হতভাগা? যেমন ক'রে হোক তোকে পোঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধরেচে। ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে, নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম! চল্ যেমন করে পারিস্ নিয়ে চল্। এই বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথার প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রের অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণটেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া

উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন ?

তারপরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

......গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল ; এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। ......

ইন্দ্র কহিল সাম্‌নেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্‌না একটু জোরে ভাত খাস্‌নে ? ইন্দ্র, বল্‌না তোর ওই ওটাকে একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতে ছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাবু কহিলেন, হাতপা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নাবাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম।......

দর্জ্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন—ঠুন ঠুন পেয়ালা—। আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকিসুরে সঙ্গীতচর্চ্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম ......

...এ অঞ্চলের পথঘাট দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে

গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল; কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন।.......

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় অসিতে পারে তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধ ঘণ্টা পরে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য। জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই যে শূন্য। দর্জ্জিপাড়ার চিহ্নমাত্র কোথাও নাই।.......

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচসাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে; যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল নতুনদা!

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি।

দুজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল এবং ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত মূর্চ্ছিত প্রায় তাহার দর্জ্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া ঠুন ঠুন পেয়ালা ধরিয়াছিলেন খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীত চর্চ্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অশ্রুতপূর্ব্ব গীত এবং অদৃষ্ট পূর্ব্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন

উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন। .... কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন আমার একপাটি পাম্প?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে সংবাদ দিতেই তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তারপরে কোটের জন্য, তালাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য দস্তানার জন্য, একে একে পুনঃ পুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্ব্বোধের মত সে সব তাহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম।.......

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল।

অনুশীলনী

১। নতুনদা কী উদ্দেশ্যে নৌকাযাত্রায় বাহির হইয়াছিল? কাহারা তাহার সঙ্গী ছিল? নৌকাযাত্রায় বিপদ উপস্থিত হইল কি ভাবে? তাহার পোশাকের বৈচিত্র্য বর্ণনা কর।

২। নতুনদা চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য এই কাহিনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, লিখ।

৩। ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত খাবার আনিতে গেলে নতুনদা কি বিপদে পড়িয়াছিল?

৪। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) 'কোলকাতার বাবু' কাহাকে বলা হইয়াছে? খ) সে কোথায় চলিয়াছিল? গ) নৌকায় শ্রীকান্ত কাহার নিকট হইতে কিরূপ খারাপ ব্যবহার পাইয়াছিল। ঘ) নৌকার পাল বন্ধ হইল কেন? ঙ) কিরূপে পরে নৌকা চলিয়াছিল? চ) নতুনদার জন্য খাবার সন্ধানে কাহারা গিয়াছিল? ছ) সেই সময় নতুনদা কী করিতেছিল? জ) নতুনদাকে কুকুরগুলি তাড়া করিল কেন? ঝ) জল হইতে উঠিয়া নতুনদা প্রথমে কি বলিয়াছিল?

৫। ব্যাখ্যা কর: কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল।

৬। বাক্য রচনা কর: উজান, ঝাঁকিয়া, বিগড়াইয়া, কালাপানা।

৭। অর্থ লিখ: গলাবন্ধ, দস্তানা, অপ্রতিভ, যুপ্রসমথ, প্রশস্ত, রেষ।

জীবনবিমুখ কেতাবি শিক্ষা ও গন্তব্যহীন

ভাগীরথী তীরে

ডঃ কালিদাস রায়

[কবিশেখর ডক্টর কালিদাস রায় দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী) ডি-লিট্ (রবীন্দ্রভারতী) আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। সাতাশি বছরের এই কবি ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর পরলোক গমন করেন। এই রচনাটিতে কবিশেখর ভাগীরথী নদীর একটি রূপবৈচিত্র্য লেখন কুশলতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।]

আমাদের বাড়ী ভাগীরথীর ধারে। শিশুকাল হইতেই এই নদীর সঙ্গে আমার পরিচয়। কতবার ইহাকে শুকাইতে দেখিয়াছি কতবার ইহাকে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতে দেখিয়াছি—কতবার ইহার শান্তরূপ দেখিয়াছি—আবার কতবার রুদ্ররূপও দেখিয়াছি। এত পরিবর্তন যাহার জীবনে তাহাকে কোনদিন নির্জীব বলিয়া মনে হয় নাই।

এই ভাগীরথীকে কালবৈশাখীর দিনে দেখিয়াছি—বালুকাময়ী ; জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলায় দেখিয়াছি ইহার বেলাভূমি মরুভূমির মত ; আষাঢ়ে ইহাতে ঢল নামিতে দেখিয়াছি ঃ শ্রাবণ-ভাদ্রে দেখিয়াছি গেরুয়া রঙের জল কূলে কূলে ভরা, মত্তহস্তিবাহিনীর মত উত্তাল তরঙ্গমালা যেন কোন দেশ জয় করিতে চলিয়াছে। নদীবক্ষ শত শত পাল-তোলা নৌকায় ভরা। ফেনিল ঢেউগুলি তখন আমাদের দুয়ার পর্যন্ত আসে।

শরতে ইহার উদ্বেলতা কমিয়া যায়। তখন জেলেদের নৌকাগুলি ছুটাছুটি করে, মালবোঝাই নৌকাগুলিও দিনরাত চলে—প্রবাসীরা আনন্দ কলরোল করিতে করিতে দেশে ফিরিয়া আসে। শরতে চাঁদনী রাতে কতদিন ছাদে শুইয়া নদীর জলে জ্যোৎস্নার অপূর্ব লীলা দেখিয়াছি।

শীতকালে জল কমিয়া যায়, আমাদের বাড়ী হইতে নদীর জলধারা অনেক দূরে চলিয়া যায়। বাঁশ হোগলার সাহায্যে নদীর অর্ধেকটায় জল আটকাইয়া বাকী অর্ধেকটাই জলের গভীরতা রক্ষা করা হয়। সেই পথে ধান ও খড়ে বোঝাই নৌকাগুলি কোনক্রমে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে থাকে।

এই নদীতীরে বসিয়া বসিয়া জীবনের কত অপরাহ্ণকালেই কাটাইয়াছি। নৌকার মাঝিদের সারিগান ও আরোহীদের স্ফূর্তির কলরোল শুনিয়াছি। দূর চড়ায় ধীবরবধূরা অস্থায়ীঘরকন্না পাতিয়াছে, মাঠ কাশফুলে ভরিয়া গিয়াছে, গাঙ্গ-শালিক, চখাচখী, বালিহাঁস ও কোঁচ-বকেরদল উপর দিয়া দূর দিগন্তে মালা দোলাইয়া উড়িয়া গিয়াছে, শুশুকগুলি ডুবো-ড়ুব খেলা করিয়াছে, সবই বসিয়া দেখিয় ছি।

ক্লান্ত সূর্য তাহার সমস্ত স্বর্ণভাণ্ডার নদীর জলে ঢালিয়া দিয়া অস্ত গিয়াছে, আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে, মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, ও-পারের গ্রামের কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দূর মশানে সন্ধ্যার চিতা জলধারাকে রুধির-ধারা করিয়া তুলিয়াছে। নৌকা হইতে ভজনের গান নদীবক্ষের অন্ধকার মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, বাতাবি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়াছে। নদীতীর ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করে নাই। শীতল সান্ধ্য বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া আসিয়া সমস্ত তাপজ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছে।
এই ভাগীরথীর জলে প্রাণ ভরিয়া স্নান করিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গে মহারঙ্গে সন্তরণ করিয়া ইহার পুণ্যসলিল পান করিয়া, ইহারই দান-স্বরূপ অন্ন, দুগ্ধ, ফলফুল উপভোগ করিয়া আমার এই দেহ বর্ধিত। যখন রেল ছিল না—যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল না, তখন এই ভাগীরথীর বুকখানি বাঙ্গালী সন্তানে চিরমুখরিত থাকিত। পূর্বে শীত-

গ্রীষ্মে ভাগীরথীর এ দুর্দশাও হইত না। তখন পদ্মাই ছিল শাখানদী, ভাগীরথী ছিল মূলনদী. পদ্মার মতই প্রবলা হইয়া চিরবহমানা। এই ভাগীরথীর দুই তীর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হইয়াছি দুইটি কূল মঠ-মন্দির গঞ্জ-বাজার টোল-চতুষ্পাঠী, বাঁধা-ঘাট ও সমৃদ্ধ পুরজনপদে পরিপূর্ণ ছিল।

ভাগীরথীর প্রসাদ-লাভের জন্য বাঙ্গালীরা দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া দুই কূলে ভীড় করিত—সুখের নীড় বাঁধিত এবং নিত্য নূতন উৎসব জমাইত। আজ সেদিন গিয়াছে। আজ তাহার দুই তীর শ্মশানভস্মে ভরিয়া গিয়াছে। আজ বাহির হইতে বর্তমান সভ্যতার আকর্ষণে এবং ভিতর হইতে ম্যালেরিয়া ও জঠরাগ্নির তাড়নায় একে একে ভগীরথীর সন্তানগণ দূরে চলিয়া গিয়াছে। আমি নদীজননীর মমতা কাটাইতে না পারিয়া আজিও ভাঙ্গা ছাদে বসিয়া তাহার পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি।

অনুশীলনী

১। লেখকের ভাষায় ভাগীরথীর একটি বর্ণনা দাও।

২। "ভাগীরথীর প্রসাদলাভের জন্য বাঙ্গালীরা দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া দুই কূলে ভীড় করিত, সুখের নীড় বাঁধিতে এবং নিত্যনূতন উৎসব জমাইত"—ইহার মর্মার্থ লিখ।

৩। ছয় ঋতুতে নদীর কিরূপ পরিবর্তন ঘটিত তাহা বল।

৪। "দূর মশানে সন্ধ্যার চিতা জলধারাকে রুধির-ধারা করিয়া তুলিয়াছে"—কোন্ রচনা হইতে লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে? ইহার অর্থ বল।

৫। মৌখিক উত্তর দাও: ক) কোন্ সময়ে ভাগীরথীর বুকখানি বাঙ্গালী সন্তানে মুখরিত থাকিত? খ) ভাগীরথীর দুই তীরে কী বিস্তারলাভ করিয়াছিল? গ। ইহার দুই তীরে কী কী পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিত?

৬। অর্থসহ বাক্যরচনা কর: ধীবর, স্ফূর্তি, মশান, টোল, চতুষ্পাঠী।

নদী ও মানবজীবন / প্রকৃতিপ্রেম

হিমালয় ভ্রমণ

জলধর সেন

[রায় বাহাদুর জলধর সেন ছিলেন 'ভারতবর্ষ' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, সুসাহিত্যিক ও বিশেষ মজলিসী লোক। এক সময়ে তিনি হিমালয়ে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া ছিলেন, সেখানে বিভিন্ন সাধুসঙ্গও করিয়া ছিলেন। এই লেখাটি তাঁহার 'হিমালয়' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে উৎকলিত। হিমালয় পাহাড়ের একটি সুন্দর চিত্র লেখাটি হইতে পাওয়া যাইবে।]

সঙ্গী সন্ন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন, ঠিক করলেন। আমি বেচারা দিনটা কেমন করে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হল। আমি খানিক বেড়াচ্ছি, খানিকটা বা একখানা পাথরের উপর বসে প্রকৃতির শোভা দেখছি; অস্তায়মান সূর্যের রশ্মিজাল পর্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমার দৃষ্টি কখন ধূসর পর্বতঅঙ্গে কখন সূর্য কিরণে উজ্জ্বল অলকনন্দার উপর।

দেখতে দেখতে কতকগুলি পর্বতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। এই নির্জন প্রদেশে আমাকে একা বসে থাকতে দেখে তারা যে বিস্মিত হয়েছিল, তা তাদের চাহনিতেই বেশ বুঝতে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহস পেয়ে তারা আমাকে দুই একটা করে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে ফিরবো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রতি সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বললেও

তাদের মনের স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ হলো। এই দূরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা-বোনের স্নেহের আভাস ভারি প্রীতিকর।

অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের নিকটে একটু নির্জন জায়গা আছে বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে ব'সে পড়লুম; নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বিলম্ব নেই। কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হলো না।

নদীর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে—বেশ সুন্দর দেখ্‌তে। অপরিষ্কৃত বেশ, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে এদিকে-ওদিকে লতিয়ে পড়েছে. হাতে কতগুলো সুন্দর লতাপাতা ও ফুল। তারা উপর থেকে নেমে আস্‌ছিল। আমাকে দেখে তারা একটু থম্‌কে দাঁড়ালো, দুজনে কি বলাবলি করলে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবার যোগাড় করলে।

আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারলুম না। তাদের ডাকতেই ফিরে এল। মেয়ে দুটির মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বড়, সে একটু বেশি লাজুক। সে সলজ্জভাবে পাশের একটি বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আজন্ম পার্বত্য প্রকৃতির মধ্যে বর্ধিত হলেও তার লজ্জাশীলতা দেখ্‌লুম আমাদের বঙ্গ-বলিকার মতই প্রবল এবং সেই রকম মধুর। ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়োলো। আমি তাদের বাড়ি কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আরম্ভ করলাম। প্রথমে তাদের কথা কইতে একটু বাধ-বাধ ঠেকলো, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো, সব কথা

মনে নেই, কিন্তু একটা কথা আমার বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে।

আমি যখন তাকে বললুম যে, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই, তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষুদুটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমল স্বরে বললে—"লেড়কি ভি নেই?" কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হলো! আমার একটি "লেড়কি" ছিল, জানিনে কোন্ অপরাধে তাকে তিন বৎসর আগে হারিয়েছি। আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নে সেই সুপ্ত-স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো। আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেল। সে তার অপরিষ্কার ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল। আর সেই স্নেহস্পর্শে, তার অকপট সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বালিকা আমাকে আর কোন কথা বল্‌তে পারলে না আমি জানতে পারলুম মেয়েটি তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তাই বুঝি তার মনে হয়েছিল মানুষের একটি মেয়েও না থাকা কতটা অসম্ভব!

সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে এল। মেয়ে দুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে লাগ্‌লো, আর ঘন ঘন "হুঁশিয়ারি" "খবরদারি" বলতে লাগলো, পাছে আমার পায়ে ঠক্কর লেগে আমার পায়ে ব্যাথা হয়। আমাকে তারা রাস্তায় তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। আমার বড় কষ্টবোধ হলো। হায়, আবার কখনো কি জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যদিই বা হয়, তা হলে আর কি তাদের সেই করুণা-রূপিণী সরলা বালিকা-মূর্তিতে দেখ্‌বো?—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসার দিকে অগ্রসর হলুম।

অনুশীলনী

১। হিমালয়ের প্রকৃতির পরিচয় এই রচনায় কি পাওয়া যায় ?

২। সংসারত্যাগী লেখকের মনে সরলা পাহাড়িয়া বালিকার দরদের প্রশ্নে ও মমতার স্পর্শে কী ভাবের উদয় হইল বিবৃত কর।

৩। পাহাড়িয়া বালিকার কোন্ কথাটি লেখক ভুলিতে পারেন নাই এবং তাহার কারণ কি ?

৪। "সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে বসে পড়লুম"—কে কোথায় বসিয়াছিলেন ? সেখানে তাঁহার মনে কী ভাবের উদয় হইয়াছিল ?

৫। "মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে।"—কে মুখ ফিরিইয়া পিছনে চাহিয়াছিলেন ? মেয়ে দুটিকে দেখিতে কিরূপ ? তাহারা কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছিল ?

৬। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) 'হিমালয় ভ্রমণ রচনার লেখক কে ? খ) পার্ব্বত্য রমণীগণ লেখককে ঘিরিয়া ধরিল কেন ? গ) লেখকের নিকট তাহাদের কি জিজ্ঞাস্য ছিল ? ঘ) তিনি তাহাদের নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইলেন ? ঙ) সন্ধ্যার একটু আগে লেখক কোথায় আসিয়া বসিলেন ? চ) সেখান হইতে একটু দূরে তিনি কাহাদের দেখিতে পাইলেন ? ছ) 'লেড়কী ভি নেই' এ কথা কে কাহাকে বলিয়াছিল ? জ) এই প্রশ্নে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? ঝ) কাহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখককে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল ?

৭। অর্থ লিখ :

অস্তায়মান, রশ্মিজাল, আর্দ্র, প্রীতিকর, শিলাখণ্ড, কলতান, প্রলোভন সংবরণ, করুণারূপিণী।

ভাষা ও অঞ্চল ভেদে মানবপ্রকৃতির অভিন্নতা লিখ।

পল্লীর অর্থনৈতিক সংস্কার

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

[বর্তমান ভারতের অর্থনীতির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশের পল্লীর অর্থনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে বহু আগেই নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইদানীং এই ধারাতেই সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।]

শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন পল্লীতে বাস করিতে হইবে, হাটে হাটে ভ্রমণ করিতে হইবে। পল্লীসমাজে দেশবিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কৃষিকর্মের কথা শুনাইতে হইবে। তাহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নানা উপায়ে উন্নত করিতে হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী স্বদেশসেবকগণকে গ্রামের ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

গ্রামের পুষ্করিণীগুলির প্রতিবৎসর সংস্কার করাইতে হইবে। নদীর গতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে হইবে, যেখানে কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে, সেখানে গিয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া কৃষকদের কর্মে সাহায্য করিতে হইবে। চাষআবাদের কি কি অসুবিধা আছে, তাহাদিগের হালের গোরু এবং যন্ত্রাদির কিরূপ অভাব, জল সেচনের ব্যবস্থা কিরূপ, শস্যসমূহের বীজ-সংগ্রহ এবং সংসারের ব্যবস্থা কি প্রকার – এই সমুদয় তথ্য অবগত হইয়া চাষীদের কার্যে নিজ নিজ বিদ্যা প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে খাঁটি কৃষক সাজিতে হইবে। গ্রামে মহাজনের অত্যাচার আছে কিনা; গ্রামে কতজন কৃষক ঋণভারগ্রস্ত, কতজন লোক মহাজনের নিকট ঋণ

গ্রহণ করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে ; গ্রামের সুদের হার কত, কিস্তি খেলাপী সুদ কিরূপ, গ্রামের পাইকারি ও আড়তদাররা কিরূপ দাদন দিয়া থাকে, এই সকল অবস্থা বুঝিয়া ধনবিজ্ঞানের উপদেশগুলি গ্রাম্য সমাজের কাজে লাগাইতে হইবে।

যাহারা শিল্পবিজ্ঞান, ব্যবসায় বিদ্যা শিখিয়া সুপণ্ডিত হইতেছে, তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য এখন এই সমুদয় তথ্য সংগ্রহ এবং গ্রাম্য জীবনের উন্নতিবিধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। এখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে স্বয়ং গ্রামে বসিয়া কৃষকের অসম্পূর্ণগুলি সম্পূর্ণ করিতে হইবে—হাতেকলমে কাজ দেখাইয়া শিল্পীদিগকে উন্নত শিল্প-প্রণালী প্রবর্তনে উৎসাহিত করিতে হইবে।

পল্লীবাসীদিগের অসংখ্য অভাব অভিযোগ। তাহাদের আশা ও আকাঙ্খা জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রামের সমস্ত কৃষক, সমস্ত শিল্পী, সমস্ত শ্রমজীবীর নিকট হইতে তাহাদিগের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে—পরিবারের মধ্যে কয়জন উপার্জন করে, যদি কর্ম করিয়া থাকে, ঐ কর্ম কত বৎসরের, কর্মের কারণ কি বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপসম্বন্ধীয় ব্যয়ের জন্য কিনা, যদি পরিবারের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে উহা কিরূপে ব্যয়িত হয়, কোনো অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় কিনা।

গ্রামের হাটে হাটে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, পল্লীর হাটে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানী হইতেছে। সে-সমস্ত দ্রব্য পল্লীগ্রামেই প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, গ্রাম হইতে শস্যের রপ্তানি কি পরিমাণে হয় ; উহার সঙ্গে পল্লীগ্রামের দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা। প্রত্যেক মণ পাট, ধান, গম, বুট, সরিষার জন্য কৃষক অথবা পাইকারগণ কত লাভ করে ; গ্রামে জমিবন্ধক দিবার জন্য

কি প্রণালী অনুসৃত হয়; খায়খালাসী কটকবলা প্রভৃতি কিরূপে প্রচলিত ইত্যাদি নানা বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেখানে জেলা, তাঁতী, ভাস্কর, কাঁসারী তাহাদিগের আপন আপন কুটীরে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহাদের উপকরণ উপাদান তাহারা কিরূপ মূল্যে ক্রয় করে, পাইকারেরা তাহাদের দ্রব্য শহরে বিক্রয় করিয়া কিরূপ লাভ করে প্রত্যেক গ্রামে মণ্ডলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে গ্রামে দলাদলি আছে কিনা, মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে গৃহবিবাদ, গ্রাম্যবিবাদ প্রভৃতি মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ঐ কার্যে কি উপায়ে সহায়তা করা যায়। গ্রামের নৈতিক অবস্থা কিরূপ গ্রামে কতজন মদ্যপায়ী, তাড়িখানার সংখ্যা এবং আবগরীর আয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, মদ্যপান নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত—এইরূপে পল্লীসেবকগণকে বিভিন্ন প্রকার বৈষয়িক এবং সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

পল্লীগ্রামের চিন্তাজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার জন্য প্রাচীন পুঁথি, কুলজীগ্রন্থ প্রাচীন গীত, ছড়া, প্রবচন জনপ্রবাদ প্রভৃতি সঙ্কলন করিতে হইবে। পল্লীসমাজের আমোদপ্রমোদ, ধর্মকর্ম, মেলা উৎসব, প্রভৃতির ধর্ম বুঝিতে, চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সরসতা সজীবতার সঞ্চার করিতে হইবে। লোক-শিক্ষার জাতীয় প্রণালী বুঝিতে হইবে, কথকতা যাত্রা এবং কবিগান রামায়ণগান, চণ্ডীগান, রায়বেঁশে, সারি জারি ও বাউলের গান, নামকীর্তন প্রভৃতিতে বাংলার পল্লীসমাজে কেমন আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা-প্রচারের বিপুল আয়োজন রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রচাররীতি বজায় রাখিয়া ইহাদের বিষয়

ও প্রণালী সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে পারা যার কিন তাহা ভাবিতে হইবে। গ্রামে কোথায় কোন ভাল কথক, কবি, যাত্রাওয়ালা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সামান্য কুটীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে লোক শিক্ষা-প্রচার কার্যে যথাসম্ভব নিযুক্ত করিতে হইবে।

যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, 'মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা', যেখানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে, 'ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত-বুনা কাজ ভালই কর,' যেখানে মাঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদাস প্রাণে গাহিতেছে 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারি না।' সেখানে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের, গভীরতা বুঝিতে হইবে। গ্রামে যে মুদি প্রত্যহ দোকানে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের নিকট সীতা-সাবিত্রীর দুঃখ কাহিনী, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, বেহুলার নিষ্ঠা এবং রঘুনাথ-হরিদাসের অটল ভক্তির কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই সহজ সরল ধর্মজীবনের ভিতরকার সুরটির সহিত অমাদিগকে হৃদয়ের সুর মিলাইতে হইবে।

অনুশীলনী

১। পল্লীর অর্থনৈতিক সংস্কার কি কি ভাবে সাধন হইতে পারে?

২। পল্লীগ্রামের চিন্তাজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোন্ কোন্ পথে হইতে পারে?

৩। কোন্ কোন্ অবস্থা বুঝিয়া ধনবিজ্ঞানের উপদেশগুলি গ্রাম্য সমাজের কাজে লাগাইতে হইবে?

৪। পল্লীসেবকগণ কীভাবে পল্লীর বৈষয়িক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে ?

৫। "সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই সহজ.........সুর মিলাইতে হইবে।"

—কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূল অর্থ কী ?

৬। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) লেখক শিক্ষিত ব্যক্তিকে কোথায় বাস করিবার নির্দেশ দিয়েছেন ? খ) তাঁহার এইরূপ নির্দেশের কারণ কি ? শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে খাঁটি কৃষক সাজিতে হইবে কেন ? ঘ) কৃষকদের আর্থিক অবস্থা কিরূপে জানিতে হইবে ? ঙ) পল্লীবাসীদিগের অভাব অভিযোগ ও আশা আকাঙ্খা জানিবার উপায় কি ? চ) পল্লীর হাটে হাটে কী কী অনুসন্ধান করিতে হইবে ? ছ) পল্লীবাহীদের হৃদয়ের ভক্তি ও প্রেমের গভীরতা কী ভাবে বুঝতে হইবে ?

৭। অর্থ লিখ :

ধনবিজ্ঞান, বিজ্ঞানবিদ্, পারদর্শী, সংস্কার, কিস্তি, দাদন, খায়খালাসী. কটকবালা, আবগারী, কুলজী গ্রন্থ, নামকীর্ত্তন, কথক, প্রবচন।

৮। টীকা লিখ :

কবিগান, রায়বেশে, সারি-জারি, বাউলগান, সাবিত্রী, বেহুলা, রঘুনাথ হরিদাস।

পল্লী উন্নয়ন

এভারেষ্ট অভিযান

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[অভিযাত্রীরা শেষ পর্যন্ত এভারেষ্ট জয় করিয়াছেন। পৃথিবীতে অভিযাত্রীদের অগম্য স্থান আর একটিও রহিল না। মেরু-মরু সাগরতল সমস্তই জয় হইয়াছে, সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গও বিজিত হইয়াছে। চন্দ্রগমনও সম্ভব হইয়াছে। মহাশূন্যে বিচরণও আজ দুঃসাহসিকদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এখানে লেখক কি ভাবে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয় সাফল্য মণ্ডিত হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।]

চিরতুষারাচ্ছন্ন এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৯,১৪২ ফুট অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মাইলের কিছু বেশি। এত উঁচু গিরি শৃঙ্গ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। সমতলভুমিতে এই দূরত্ব পায়ে হেটে পার হওয়া কিছুই নয়। কিন্তু উপর দিকে ওঠাই সুকঠিন।

মানুষের কাছে সুগভীর বনের মধ্যভাগ, বিশাল মরুভূমি, উত্তর ও দক্ষিণমেরুর তুষারময় নির্জন প্রদেশ, সমুদ্রের নিম্নভাগ ক্রমে নিজ নিজ রহস্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু উনত্রিশ হাজার একশ বিয়াল্লিশ ফুট উপরে গৌরীশঙ্করের চূড়ায় কি আছে মানুষ বহুকাল তা জানতে পারেনি, অথচ সে বিমানে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটেরও বেশী উপরে উঠে গেছে। এখন তো কোন-কোন যাত্রীবাহী বিমান ছত্রিশহাজার ফুট উপর দিয়ে ঘন্টায় পাঁচশ ত্রিশ মাইলেরও বেশী বেগে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করছে।

গৌরীশঙ্করের চূড়ায় কি আছে মানুষ জানতে পারেনি সত্য, কিন্তু তার জানবার আগ্রহ ক্রমেই এত বৃদ্ধি পায় যে, অবশেষে ইউরোপের কয়েকজন লোক পায়ে হেঁটে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু কিছুদূর গিয়ে তাঁদের ফিরে আসতে হয়। তাঁদের পর থেকে প্রায় দু-তিন বৎসর অন্তরই ইউরোপ থেকে অভিযাত্রী দল এসে এভারেস্ট শৃঙ্গবিজয়ের চেষ্টা করেন। আর, তাঁদের সে কাজে সাহায্য করে হিমালয়ের ঐ অঞ্চলের কতকগুলি পাহাড়ী অধিবাসী, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ম্যালোরি ও আর্ভিন নামে দুজন ইংরেজ আরোহণকারী এভারেস্ট শৃঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দেন।

ব্যর্থতার কারণও অনেক। সেগুলির মধ্য চারটি প্রধান। প্রথম কারণ, ওখানকার আবহাওয়ার অস্থিরতা। উপর দিকে মূহুর্মুহু তুষার ঝড় ওঠে। দ্বিতীয় কারণ, গাঢ় কুয়াশা। তার ফলে কিছুই দেখা যায় না। তৃতীয় কারণ, প্রচণ্ড শীত ও বিশালাকার তুষার চাপের সবেগে নিম্ন অবতরণ। চলার পথে বড় বড় শিলাখণ্ডকে সবেগে নীচে নামায়। চতুর্থ কারণ, ওখানকার বাতাসে অম্লজানের স্বল্পতা; সেজন্য উপযুক্ত শীতবস্ত্র, খাদ্য, ঔষধপত্র, তাঁবু ও অম্লজান-ভরা যন্ত্রাদি সঙ্গে নিতে হয়। প্রত্যেকবারই অভিযাত্রিগণ এ সকল সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবু প্রত্যেকবারই একটা-না-একটা কারণে অভিযাত্রীদলকে ফিরে আসতে হয়।

তবে দুবার দুটি দল চূড়ার প্রায় কাছাকছি উঠতে পেরেছিলেন। অভিযানগুলির বিফলতা থেকে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, অত উঁচুতে পায়ে হেঁটে ওঠা দুঃসাধ্য। এভারেস্ট অজেয়! তাই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বিমানেএভারেষ্টের উপর উড়বার আয়োজন হয় এবং দুজন ইংরেজ বৈমানিক দু'খানি বিশেষ ধরণের বিমানে এভারেষ্ট ছাড়িয়া এক'শ ফুট উচুতে বিমান চালনা করেন। তাঁরা তখনকার যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সবটুকু এখানে লেখা সম্ভব নয়। তাঁরা লিখেছেন—

"কুয়াশার রাজ্য পরেই দেখলাম, চারধারে রৌদ্রোজ্জ্বল পর্বত-

মালা। আর, আমাদের প্রায় সামনে উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে রাজোচিত গর্ব ও গাম্ভীর্যে এভারেষ্ট।.....

তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তুষার ঢাকা মাকালু পর্বত। আর তার ওপরে প্রকট হয়ে আছে এভারেষ্টের দুর্লঙ্ঘ্য সুকঠোর দক্ষিণাংশের ভীমমূর্তি।

"বিমান আমাদের নিয়ে উপর দিকে বেগে উঠেছে, আর এভারেষ্ট যেন ভীমমূর্তিতে ছুটে আসছে! তার ভাবটা যেন এই, সে আমাদের এগোতে দেবে না। কিন্তু আমাদের বিমান নিমেষে তার মাথা ছাড়িয়ে মাত্র একশ' ফুট উপরে উড়ে গেল।".......

এর পরও পায়ে হেঁটে উঠবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নি ১৯৫২ খৃষ্টাব্দেও ল্যামবার্ট নামক একজন সুইস পায়ে হেঁটে এভারেষ্টের ২৮,২১০ ফুট পর্যন্ত উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, 'তুষার শার্দুল' শেরপা তেনজিং নোরকে। তিনি তো সর্ব্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত উঠতে আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু ল্যামবার্ট তাঁর সে প্রস্তাবে সম্মত হন নি। উভয়ে সেখান থেকেই ফিরে আসেন। সেবার তেনজিং একাই যে এভারেষ্টকে জয় করতে পারতেন, এতে সন্দেহ নেই।

তেনজিংএর সেবার চূড়ায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে পৌঁছতে বাকি ছিল মাত্র সাতশ' ফুট। তবে আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে আসে। তাই ল্যামবার্ট তাঁকে বলেন, "আবহাওয়া আরো খারাপ হতে পারে।"

তেনজিং বলেন, "আমার কোন ক্ষতি হবে না। গৌরীশঙ্কর আমার বন্ধু। সে আমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি নিরাপদে উঠে যেতে পারবো।"

তারপর ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে পৃথিবীর অজেয় গিরিশৃঙ্গটিকে মানুষের কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়। শেরপা তেনজিং নোরকে

ও স্যার এডমণ্ড হিলারি পায়ে হেঁটে এভারেস্ট শৃঙ্গে সর্বোচ্চস্থানে পৌঁছে মানুষের অধ্যাবসায়ের বিজয়কেতন উড়িয়ে দেন।

এবারকার অভিযানের নেতা ছিলেন কর্ণেল হাণ্ট নামে একজন ইংরেজ। তিনি পূর্বের অভিযানগুলির ব্যর্থতার কারণগুলি সযত্নে অনুধাবন করে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর একটি বড় সহায়।

এডমণ্ড হিলারি ছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁর বয়স ৩৫ বৎসর। আর তেনজিং নোরকে দরিদ্র, নিরক্ষর এক পাহাড়ী। তাঁর বয়স ৪০ বৎসর। তাঁর আদিবাস ছিল নেপাল তিব্বত-সীমান্তে একখানি ছোট শেরপা গ্রামে। সেখান থেকে তিনি সপরিবারে স্ত্রী ও দুটি কন্যা সহ দার্জ্জিলিঙে এক দরিদ্র পল্লীতে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস স্থুরু করেন। তিনি ছ'বার বিভিন্ন দলের সঙ্গে এভারেস্ট বিজয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, "উপযুক্ত সাহায্য ও সরঞ্জাম পেলে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ীরাও এভারেস্ট জয় করতে পারেন।"

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্মরণীয় অভিযান সম্বন্ধে স্বয়ং তেনজিং যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার কিছু অংশ এই:—

"সেই স্মরণীয় দিনের সকাল। ৯ নম্বর শিবির থেকে আমরা যাত্রা করলাম। আজই বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ জয় করবো— আমি এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনে পড়ে, আমার তখন একমাত্র চিন্তা—মৃত্যুও যদি আসে, তবুও আমি শৃঙ্গে উঠতে চাই। মৃত্যু আর সেদিন আমাকে এতটুকু শঙ্কিত করতে পারে নি।......

"শিবির থেকে শৃঙ্গ পর্যন্ত একবার আমি আগে একবার হিলারী আগে—এইভাবে উঠতে থাকি। আরোহণ বা অবরোহণের সময়ে

যে পিছনে থাকে তার দায়িত্ব আগের লোকের চেয়ে অনেক বেশি ও কষ্টসাধ্য। কারণ প্রকৃত পক্ষে তিনিই 'নোঙর'। আগের লোকটি কেবল সম্মুখের পথে বরফে পা রাখার মত খাঁজ কেটে যাবেন আর সহজ পথ খুঁজে বার করবেন।......

"প্রায় একঘণ্টা একটানা ওঠার পর আমাদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান শেষ হয়। এইবার আমাদের ওঠার পর পশ্চিমাভিমুখী। এইপথে আছে কয়েকটি শ্রেণীবদ্ধ খাড়া পাহাড়, সেগুলি অতিক্রম করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য। শৃঙ্গগুলি যেন এভারেস্ট শৃঙ্গের প্রহরী—পদে পদে আমাদের বাধা দিয়ে অভিযানকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করবার পর এভারেস্ট আমাদের কাছে আর মাত্র ৬০-৭০ ফুটের মধ্যে এসে পড়লো। এই পথে আর কোন বাধা নেই। আছে কেবল তুষারমণ্ডিত ক্রমোন্নত পর্বতগাত্র। তা ক্রমে শৃঙ্গের তলদেশে মিশেছে। এই পথ তত বিপজ্জনক নয়, ওঠাও তত কষ্টকর নয়। তবুও আমরা সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হই। এইভাবে আমরা প্রায় একই সঙ্গে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের শিখরে আরোহণ করি।....

"অবশেষে চোমো লুঙ মা (এভারেস্টের স্থানীয় নাম) শিখরে উঠে আমরা সফলতার গৌরবে অভিভূত হয়ে পড়ি। কৃতজ্ঞঅন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিস্কুট ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করি। ছ'বার বিফল মনোরথ হবার পর সপ্তমবারে সাফল্য লাভ করতে পারলাম।"

অনুশীলনী

১। এভারেস্ট কোথায়? ইহার উচ্চতা কত?

২। এভারেস্ট আরোহণ চেষ্টা কত দিন হইতে হইতেছে? কেন ইহা দুরারোহ?

৩। কি করিয়া, কাহারা ইহাকে জয় করিল ?

৪। যাহারা জয় করিল তাহাদের পরিচয় দাও।

৫। "ওখানকার বাতাসে অম্লজানের স্বল্পতা,"—কোন্ রচনা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ স্থানের কথা বলা হইয়াছে ? অম্লজান কী ?

৬। "তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তুষার শার্দূল,"—কাহার সঙ্গে তুষার শার্দূল ছিলেন ? এই শব্দটির অর্থ কি ? ইহার দ্বারা কাহাকে বুঝান হইয়াছে ?

৭। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) এভারেষ্ট জয়ের ব্যর্থতার কারণ কী কী ? খ) ল্যামবার্ট কত খৃষ্টাব্দে এভারেষ্ট অভিযান করেন ? গ) তিনি কত ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন ? ঘ) তাঁহার সঙ্গী কে ছিলেন ? ঙ) কোন্ খৃষ্টাব্দে প্রকৃতই এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় সম্ভব হইয়াছিল ? চ) সেই অভিযানের দলনেতা কে ছিলেন ? ছ) প্রথম যাঁহারা এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন তাহাদের নাম কর। জ) এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণের পর তাঁহারা কি করিলেন ? ঝ) এভারেষ্ট শৃঙ্গের স্থানীয় নাম কি ?

৮। অর্থ লিখ :

অভিযাত্রী, সরঞ্জাম, বৈমানিক, দুর্লঙ্ঘ্য, ভীমমূর্তি, শিবির, পদক্ষেপ, কৃতজ্ঞ-অন্তরে, মনোরথ।

৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

তুষারাচ্ছন্ন, মুহুর্মুহু, রৌদ্রোজ্জ্বল, রাজোচিত।

অভিযান-কাহিনী
দুঃসাহসের খেলা

নীলকরের অত্যাচার

যোগেশ চন্দ্র বাগল

[উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে নীলচাষ আরম্ভ হয়। ইংরেজ নীলকর সাহেবগণ অত্যাচার ও উৎপীড়ণ করিয়া দেশীয় কৃষকদের সাহায্যে নীলচাষ করিত। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই অত্যাচারের প্রতিবাদে জনমত ও আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই প্রবন্ধে নীলকরের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে।]

মধ্যবঙ্গের যশোহর নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে নিরীহ নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। মফস্বলের ফৌজদারী বিচারালয় তাহাদের বিচারের অধিকারী ছিল না। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে যদি বা তাহাদের বিচার হইত তাহা হইলেও গুরুতর জঘন্য অপরাধ করিয়াও অপরাধীর কয়েক শত টাকা মাত্র জরিমানা হইত, কিন্তু সেই অপরাধে অপরাধী বাঙালীদের হয়তো প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল কারাবাস হইয়া যাইত। বিচারে এতাদৃশ অনাচার অহরহ ঘটিত। মফস্বলে ইংরেজ পুঙ্গবেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া চলাফেরা করিত। একেই তো ব্যবসায়ের স্বার্থ তাহার উপর আইনের ব্যবহার-বৈষম্য উহাদিগকে একেবারে 'নবাব' করিয়া তুলে। ইংরেজদের মেয়েরা নিজেদের "রাণী ভিক্টোরিয়া" বলিয়া পরিচয় দিত বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। ইহাদের অত্যাচারের কথা

বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে বাহির হইলেও ১৮৪৯ সনে অক্ষয় কুমার দত্তই পরিষ্কারভাবে এসকল বিষয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলেন। ইহার পর হইতে সংবাদপত্রে নীলকরদের অত্যাচারের কথা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতে থাকে। হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এ বিষয়ক বিবরণ সযত্নে মুদ্রিত করিতেন।

ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিন্দু পেট্রিয়টে যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এমনটি তখনকার কোনও পত্রিকায়ই বাহির হইত কিনা সন্দেহ। নীলকরদের অত্যাচারের কথা হরিশচন্দ্র যথারীতি পেট্রিয়েট প্রকাশ করিতেন এবং তাহার উপর টিপ্পনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। এ কারণে কলিকাতার ইংরেজী ব্যবসায়ী মহল এবং ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকা সমূহ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল। কিন্তু ১৮৬০ সনে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীল-করদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তাহারা নীল বুনিবে না এবং কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট' তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার ন্যায্যতার সপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল হরিশ্চন্দ্রের নিজের পক্ষে কি বিষময় হইয়াছিল একটু পরেই তাহা বলিতেছি। ইতিমধ্যে যখন নীলের হাঙ্গামা মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইল তখন সরকার এই মর্মে এক সাময়িক আইন জারী করিলেন যে, চুক্তিবদ্ধ নীলচাষীরা নীল না বুনিলে ফৌজদারিতে দণ্ডনীয় হইবে। নীলকর বন্ধু শ্বেতাঙ্গ হাকিমেরা বহু নীলচাষীকে এই আইনের দোহাই দিয়া জেলে পুরিল, তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচারও শুরু হইল। রাজ-কর্মচারী ও নীলকরগণ ঘোর অত্যাচার উৎপীড়ণ করিতে থাকে।

স্যাঁতসেতে, ছোট ও সঙ্কীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদরাখা, বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নীলকরের প্ররোচনায় পুলিস কর্তৃক প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের উপর অনেক রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন হইত।

শ্বেতাঙ্গ বণিক ও হাকিমের দৌরাত্ম্যে মফস্বলের উকীল মোক্তারগণ প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করিত। যেসব স্থলে মোটেই উকীল মোক্তার পাওয়া যাইত না সে স্থলে হরিশ্চন্দ্র কলিকাতা হইতে ব্যবহারজীবী প্রেরণ করিতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ পাদ্রীগণ এবং উচ্চপদস্থ কয়েকজন ইংরেজ নীলচাষীদের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। পাদ্রী লঙ্ নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় আদালতে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নীল-কমিশনে প্রজাবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের ও অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন লোকের সাক্ষ্য হইতে ইংরেজ নীলকরের জঘন্য অনাচার অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় জগৎ সমক্ষে উহাদের মর্যাদার একেবারে অবলুপ্তি ঘটিল। অনেকে নীলচাষ ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করে।

অনুশীলনী

১। নীলকর কাহারা? তাহারা দেশীয় কৃষকদের উপর অত্যাচার করিত কেন? দেশীয় কৃষকদের পক্ষে কে কিভাবে নীলকরের অত্যাচারের মোকাবিলা করিয়াছিলেন?

২। নীলকরদের অত্যাচার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর :

ক) ইংরেজদের মেয়েরা……প্রসিদ্ধি আছে।

খ) শ্বেতাঙ্গ বণিক ও হাকিম……দ্বিধাবোধ করিত।

৪। অর্থ লিখ :

জরিমানা, নিরঙ্কুশ, স্বৈরাচার, টিপ্পনী, শ্বেতাঙ্গ, আনুকূল্য, অবলুপ্তি, ফৌজদারি, হাকিম।

৫। টীকা লিখ :

রাণী ভিক্টোরিয়া, তত্ত্ববোধিনী, হিন্দু পেট্রিয়ট।

৬। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে নীলচাষ হইত ?

খ) হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কে ছিলেন ?

গ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কোন্ সংবাদ পরিষ্কারভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ?

ঘ) অক্ষয় কুমার দত্ত কে ?

ঙ) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কে ?

উপরিলিখিত প্রশ্নের একটি দিও

পদ্যাংশ



সীতার বনগমন

কৃত্তিবাস ওঝা

[বনগমন কালে রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইতে চাহেন নাই—এইজন্য তিনি অনেক যুক্তি দেখাইলেন। সীতা কিন্তু কিছুতেই ভয় না পাইয়া সর্ববিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গিনী হইতে চাহেন। তাঁহার যুক্তিতে অসাধারণ তেজস্বিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙলার আদিকবি কৃত্তিবাস তাঁহার অপূর্ব ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়াছেন।]

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে ॥
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস ॥
তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি ॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনকদুহিতে।
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সাথে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসীরাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মন সুখে।
ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ॥

শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ ভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥
বহু তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেলাহ গায়ের আভরণ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটি হইতে সীতার তেজস্বিতার কি পরিচয় পাওয়া যায়?
২। রাম ও সীতার কথোপকথন বর্ণনা কর।
৩। কি কারনে রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইতে চান নাই।
৪। "ক্ষুধাতৃষ্ণা যদি……করিব বারণ"
—কোন্ রচনা হইতে লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মর্ম্মার্থ কি?

৫। বাক্যাংশের আলোচনামূলক প্রশ্ন :

ক) "গেলেন লক্ষ্মণসহ সীতা সম্ভাষণে"

—কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে ? লক্ষ্মণ কে ? সীতা কে ?

খ) "জানকী বলেন দুঃখে হইয়া নিরাশ"

—কোন্ রচনা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে ? জানকী কে ?

গ) "বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সাথে"

—কোন রচনার অন্তর্গত ? কে কাহাকে ইহা বলিয়াছেন ? দণ্ডক বন কোথায় ?

৬। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) কৃত্তিবাস ওঝা কে ? খ) রামচন্দ্র কেন বনে গিয়াছিলেন ? গ) তিনি সীতাকে কেন সঙ্গে লইতে চাহেন নাই ? ঘ) সীতা কোন যুক্তি দেখাইয়া রামচন্দ্রের বনগমনে সঙ্গিনী হইয়াছিলেন ?

৭। অর্থ লিখ :

জীয়ে, সংহতি, কুপিত, সন্তাপ, অগুরু, চন্দন, চুয়া।

পাতিব্রত্যের আদর্শ



যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ব

কাশীরাম দাস

[মহাশত্রু দুর্য্যোধনকে সপরিবারে চরম দুর্দশা হইতে রক্ষা করিয়া যুধিষ্ঠির উপদেশ দিয়া বিদায় দিতেছেন। এই অংশটি কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে গৃহীত। যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় জয় মহত্ত্ব ইহাতে প্রকাশিত। গন্ধর্ব চিত্রসেনকে পরাস্ত করিয়া অর্জুন জ্ঞাতিশত্রুদের রক্ষা করিলেন। ইহাতে চিত্রসেন বিস্মিত হইয়াছেন।]

কহ পার্থ কোন্ কাজে আসিলে হেথায়।
দুর্যোধন উপকারে আসিতেছ হায়॥
এই যে আশ্চার্য্য বড় লাগে মোর মনে।
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট তোমা পঞ্চজনে॥
তাহার উচিৎ ফল পাইল দৈবগতি।
চল শীঘ্র বাহুড়িয়া, চল মহামতি॥
পার্থ বলে জ্ঞান-লেশ নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায়॥
আপনা-আপনি নিজে যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্ম-পর কভু নহে প্রতিপক্ষ 'পরে॥
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্যোধনে নহে যাবে যমালয়॥
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা, দোঁহে লঘুহস্ত।
বৃষ্টিবৎ পার্থ ফেলে শত শত অস্ত্র॥

যেই বাণে দুর্য্যোধনে গন্ধর্ব্ব বাঁধিল।
সেই বাণ ধনঞ্জয় সন্ধান করিল।।
বান্ধিল গন্ধর্ব্ব-ভুজ গলার সহিত।
তবে পার্থে মায়ারথ ছাড়িল ত্বরিত।।
চড়িয়া গন্ধর্ব্ব-রথে হরষিত মতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা ধর্ম্মপতি।।
গন্ধর্ব্ব আছয়ে বন্দী, রাজা দুর্য্যোধন।
রথের সহিত যত রমণীর গণ।।
শিরেতে বন্দিয়া পার্থ ধর্ম্মের চরণ।।
সমর্পিয়া সকল করিল নিবেদন।।
তবে শীঘ্র দোঁহার বন্ধন মুক্ত করি।
পার্থে অনুযোগ করে ধর্ম্ম-অধিকারী।।
এই চিত্রসেন হন গন্ধর্ব্বের পতি।
ইঁহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি।।
গন্ধর্ব্ব বিদায় হয়ে গেল নিজ স্থান।
দুর্য্যোধন আসি তবে করিল প্রণাম।।
বসিল মলিন মুখে হয়ে নতশির।
মধুর বচনে কহে রাজা যুধিষ্ঠির।।
শুন ভাই হেন কর্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাকার।
বিশেষ বিভব কালে ধর্ম-আচরণ।
অতিশয় শোভে যেন সুগন্ধি চন্দন।।
কহিলা অনেক নীতি মধুরস বাণী।
আগুসরি স্ত্রীগণে আনিল যাজ্ঞসেনী।।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি হইতে যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্বের কি পরিচয় পাইলে ?

২। চিত্রসেন কিসের জন্য দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া ছিলেন ?

৩। অর্জুন ও চিত্রসেনের কথোপকথনের সূত্র বিষয়টি লিখ।

৪। "বিশেষ বিভব কালে ধর্ম-আচরণ।
অতিশয় শোভে যেন সুগন্ধি চন্দন।"

—কোন্ কবিতা হইতে পংক্তি দুইটি লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছেন ? ইহার অর্থ কি ?

৫। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) যুধিষ্ঠির কে ? খ) কেন তাঁহাকে মহৎ বলা হইয়াছে ? গ) দুর্যোধন কাহার নিকট বন্দী হন। ঘ) তাহার পরিচয় দাও। ঙ) অর্জুন কে ছিলেন ?

ক্ষমা ও সৌজন্যের আদর্শ





বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[মাইকেল মধুসূদনের এই সনেটটিতে বঙ্গভাষা সম্পর্কে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজী শিখিয়া কবি প্রথম জীবনে মাতৃভাষার অবহেলা করিয়াছিলেন, পরে সেজন্য তাঁহাকে অনুশোচনা করিতে হইয়াছে।]

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ।
তা' সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি',
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' ।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি' কায়, মন,
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্যে বরি'—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন ।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা । মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি' ঘরে।"

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণি-জালে।

অনুশীলনী

১। বঙ্গভাষা কবিতাটির মর্মার্থ লিখ।

২। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধ রত্ন কি? খ) কবি সে রত্নকে অবহেলা করিয়াছিলেন কেন? গ) পরধন বলিতে কি বুঝান হইয়াছে। ঘ) কবি রত্নপূর্ণ মাতৃভাষাকে কিরূপে লাভ করিলেন? ঙ) মধুসূদন কেন এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন?

৩। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

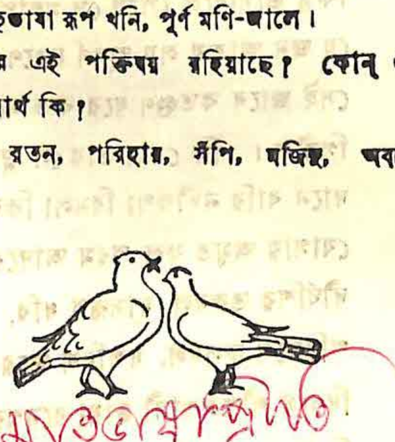
ক) পরধন, লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।

—কোন্ কবিতা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কে এই কথা বলিয়াছেন? ইহার মূল অর্থ কি?

খ) পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণি-জালে।

—কোন্ কবিতায় এই পঙক্তিদ্বয় রহিয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার ভাবার্থ কি?

৪। অর্থ লিখ: রতন, পরিহরি, সঁপি, মজিনু, অবরেণ্যে কেলিনু শৈবাল, মাতৃকোষে।



বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[আধুনিক বাঙলা কবিতার স্রষ্টা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি এই কবিতাটিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতার নাম সনেট। চৌদ্দ অক্ষরে গড়া চৌদ্দ চরণে সনেট রচিত হয়। মধুসূদন এই শ্রেণীর কবিতার নাম দিয়াছিলেন চতুর্দশপদী কবিতাবলী।]

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারত,
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু। উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্বতে
যে জন আশ্রয় লয় স্বুবর্ণ চরণে
সেই জানে কতগুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে স্বুখসদনে
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুলদল, দশদিশ ভরে।
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী
নিশায় স্বুশান্তনিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে॥

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগরের কি কি গুণের পরিচয় কবিতাটি হইতে পাওয়া যায়?

২। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

ক) "কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে……ধরে কত মতে গিরীশ"

–কোন্ কবিতা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মূলভাব কি?

খ) "দিবসে শীতল স্বামী……ক্লান্তি দূর করে"

–ইহা কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে? ইহার মূল ভাবটি লিখ।

৩। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় কে ছিলেন? খ) মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল? গ) মধুসূদনের নামের পূর্বে মাইকেল নাম যুক্ত হইয়া ছিল কেন? ঘ) কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কেন করুণার সিন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন? ঙ) সনেট কাহাকে বলে?

৪। অর্থ লিখ : হিমাদ্রি, হেমকান্তি, গিরিশ, কিঙ্করী, পরিমল।

মহাজীবনের ছবি

ধনের সদ্ব্যবহার

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহাকবি ছিলেন। এই নীতিকবিতাটিতে কবি ধনের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সার্থকতা নাই।]

সাধিতে জগৎ হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্যে দেবতা সে জন।

নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে
কত দুঃখ, প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।

পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পর হিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।

বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি ক'রে,
ইচ্ছা করে' যেতে পারে নরক ভিতরে
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাত।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মার্থ লিখ।

২। ধনবানকে কবি কি নির্দেশ দিয়াছেন?

৩। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) কবি কাহাকে জগতের দুরাত্মা বলিয়াছেন? খ) কেন তাহাকে দুরাত্মা বলা হইয়াছে? গ) এই পৃথিবীতে কাহারা দেবতার বরপুত্র ও কেন?

৪। অর্থ লিখ: হিত, মনন, মহাত্মা, চরিতার্থ, বাঞ্ছা, বরপুত্র।

ধনের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার

আর্যভূমি

নবীনচন্দ্র সেন

[কবি নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' এযুগের প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য। এই কবিতায় তিনি আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন।]

ছিল যেই পুণ্যভূমি
অনন্ত ঐশ্বর্যখনি প্রাচুর্য ভাণ্ডার,
যাহার মলয়ানিলে, যাহার জাহ্নবীজলে
বহিত, ভাসিত, চির আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার!
বিদরে হৃদয় নাথ!
বল হায়, কি মংগল করিলে সাধন ?
তীব্র আর্যবংশরবি বাল্মীকি-কল্পনা-ছবি
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ ?
এই গ্রাস মুক্ত নাথ! হবে কি কখন ?
হায়! যেই আর্যনাম
আছিল জগৎ পূজ্য, আছিল অচল
অটল হিমাদ্রি-সম সিন্ধু জিনি পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল;
আজি সেই আর্যনাম পদ্মপত্রে জল!

অনুশীলনী

১। কবিতাটি হইতে আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরবের কি পরিচয় পাইলে ?

২। কবি এই কবিতায় কি আক্ষেপ করিয়াছেন।

৩। মৌখিক উত্তর দাও : ক) কবি কোন্ ভূমিকে পুণ্যভূমি বলিয়াছেন ? খ) কোথায় আজ দুর্ভিক্ষের ধ্বনি শোনা যাইতেছে ? গ) কোন্ নামে জগৎ পূজ্য ছিল ? ঘ) কবি কেন আর্যনাম পদ্মপত্রে জল বলিয়াছেন ?

৫। অর্থ লিখ : মলয়ানিলে, হিমাদ্রি, সিন্ধু, জিনি, পরাক্রম, অপার।

মস্তক বিক্রয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই শ্রেণীর কবিতাকে গাথা কবিতা বলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' হইতে কবিতাটি গৃহীত হইয়াছে। এখানে কাশীরাজ ও কোশল রাজের মহত্বের প্রতিযোগিতার একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলা হইয়াছে।]

কোশল-নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশো গাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই
দীনের তিনি পিতামাতা ॥
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে ,—
'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড় করি' মানে ॥
আমার হ'তে যার আসন নীচে
তাহার দান হ'ল বেশী !
ধর্ম দয়ামায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।'
কহিলা—'সেনাপতি, ধরো কৃপাণ
সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো ॥'
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে।
কোশলরাজ হারি' রণে
রাজ্য ছাড়ি' দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।

কাশীর রাজা হাসি' কহে তখন
আপন সভাসদ্ মাঝে,
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন,
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি' বলে,—দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরে গ্রাসে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহে না ধর্মের পানে।

'আমরা হইলাম পিতৃহারা'—
কাঁদিয়া কহে দশদিক্।
'সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্!'

শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি'—
'নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি'
কাঁদিয়া মরে যত লোক?

আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এই মত কয়॥

'মন্ত্রী, রটি' দাও নগর-মাঝে
ঘোষণা কর চারিধারে,—
'যে ধরি আনি' দিবে কোশলরাজে—
কনক শত দিব তারে।'

ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটি—
রটনা করে দিন রাত।
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি' কানে দেয় হাত ॥

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিন চীর দীনবেশে।
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,—
'কোথা গো বনবাসী বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে ?
শুনিয়া রাজা কহে, 'অভাগা দেশ
সেথায় যাবে কোন দুখে ?'

পথিক কহে আমি বণিক জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি'
কেমনে র'ব প্রাণ ধরি' !

করুণা পারাপার কোশলপতি,—
শুনেছি নাম চারি ধারে,
অনাথনাথ তিনি, দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে ॥

শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি'—

পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে
দেখায়ে দিব তারি পথ!
এসেছ বহু দুঃখ অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ॥

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে,
দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
হেথায় আগমন কিসের কাজে?
নৃপতি শুধাইল হেসে।

'কোশলরাজ আমি, বন ভবন
কহিলা বনবাসী ধীরে—
আমায় ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে॥

উঠিল চমকিয়া সভার লোকে
নীরব হল গৃহতলে,
বর্ম আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল॥

মৌন রহি' রাজা ক্ষণেক তরে
হাসিয়া কহে ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি॥

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে,
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ
হৃদয় দিব তারি সনে॥

জীর্ণ চীর পরা বনবাসীরে
বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি' দিল মলিন শিরে,
ধন্য কহে পুরজনে ॥

অনুশীলনী

১। কোশলরাজকে কেন কাশীরাজ রাজ্যচ্যুত করিলেন ?

২। কোশলরাজের চরিত্র বর্ণনা করো।

৩। কি করিয়া কোশলরাজ শেষ পর্যন্ত কাশীরাজের চিত্ত জয় করিলেন ?

৪। 'মস্তক বিক্রয়' নামের সার্থকতা কি ?

৫। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

ক) "লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহেনা ধর্মের পানে।"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ? ইহার মূল অর্থ কি ?

খ) "অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এইমত কয়।"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে কে এই কথা বলিয়াছেন ? ইহার মূল অর্থ কি ?

গ) "মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে,
ধন্য কহে পুরজনে"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা কাহার উক্তি ? ইহার মূল অর্থ কি ?

৬। মৌখিক উত্তর দাও :

ক) কোশলরাজের যশের কারণ কি ? খ) কাশীরাজ কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ? গ) তাঁহার ক্রোধের কারণ কি ? ঘ) কোশলরাজের পরাজয়ে প্রজাদের মনে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল ? ঙ) কাশীরাজ নগরে কী ঘোষণা করিয়াছিলেন ? চ) কোশলরাজ কাশীরাজের সভায় উপস্থিত হইলেন কেন ? ছ) কাশীরাজ তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন ?

৭। অর্থ লিখ : নৃপতি, শরণ, দীন, বলী, অরি, কনক, চীর, অশ্রুনীরে, রুধিলা, পান্থ, মনোরথ, মৌন, শির, পুরজন।

পরার্থে আত্মদান

অমৃতকণা

রজনীকান্ত সেন

[রজনীকান্ত সেন একজন গীতিকার ছিলেন। তাঁহার নীতিকবিতাগুলিতে হিতোপদেশ অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।]

নর কহে, "ধূলিকণা তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে।"
ধূলিকণা কহে, 'ভাই কেন কর' ঘৃণা?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা?"
মেঘ বলে, "সিন্ধু তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নার' একবিন্দু জল।"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।"

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।
২। নর ও ধূলিকণা, মেঘ ও সিন্ধুর মধ্যে বিবাদের কি মীমাংসা হইল
৩। অর্থ লিখ: ধূলিকণা, ঘৃণা, র'লি, বিফল।

নীতিকথা

ফুলের ভাষা

প্রিয়ংবদা দেবী

[প্রিয়ংবদা দেবী রবীন্দ্রযুগের মহিলা কবিদের মধ্যে স্বনামধন্যা ছিলেন। এই কবিতায় বিভিন্ন ফুলের মাধ্যমে তিনি শিশুদের বিভিন্ন গুণ অর্জন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।]

রাঙা গোলাপের ফুল হাসিমুখে বলে
"হও নম্র শুচি ও সুন্দর।"
সুসিত কমলগুলি সরসীর জলে
বলে—"হও ক্রমে শুভ্রতর।"
কনক বরণ দীপ্ত ওই সূর্যমুখী
চেয়ে উর্ধ্বে নির্মল তপনে
বলে—"উচ্চে লক্ষ্য রাখ প্রেমে হও সুখী
ধৈর্য ধরো জীবনে মরণে।"
যুথিকার কলি বলে "প্রীতি কর দান
ক্ষুদ্র হও, হ'য়োনা কৃপণ।"
শেফালি হাসিয়া বলে প্রফুল্ল বয়ান
"হিমবায়ু র'বে কতক্ষণ ?"
এমনি কত না ফুল প্রতি দিনেরাতে
হাসিমুখে বলে কত কথা।
সবারে মিলায়ে যদি ভাবি এক সাথে
পাই তবে দেবের বারতা

অনুশীলনী

১। কবিতাটি হইতে কি শিক্ষা পাইলে ?

২। গোলাপ, সূর্যমুখী, যুথিকা, শেফালীর মুখ দিয়া কবি আমাদের কি উপদেশ দিয়াছেন ?

৩। অর্থ লিখ : সুসিত, সরসী, কনক, বয়ান, বারতা।

মাতৃভক্তির কর্তব্য

খেয়াডিঙি

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

[কবি যতীন্দ্রমোহনের এই কবিতায় গ্রামের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের শ্রমজীবী মাঝির দুঃখ-দুর্দশার কথাই ইহাতে প্রকাশিত।]

পাটের খেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
বাটের সাথে, হাটের সাথে কোন বাঁধন নাই,
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি,
আমি শুধু আপন মনে এপার ওপার করি।

ভাদর আসে সারা গাঙে ভরা পাথর নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার একশা ক'রে দিয়ে,
লগির গোড়া পায়না তলা, মিলে না আর থাই—
দিনে রাতে তবু আমার ঘাটের ডিঙা বাই।
হঠাৎ যে দিন বানের জলে ছাপিয়ে ওঠে মাঠ;
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টলমলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ ?
বাব্‌লা গাছের বেড়া নিয়ে কোথা বা বিবাদ ?
বাঁধন হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমা হারা সাঁতার-ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর জলে দাঁড়িয়ে ক'সে কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শীষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় উঠে ভাসি'।
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে,
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আঁটিবাঁধা পাটের রাশি এপার ওপার করি,
পালবাঁধা পাটের গাদা বোঝাই ক'রে মরি,
দিনে রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে' আপন মনে খেয়ার কড়ি গুণি।
জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূর্য্য উঠে পুবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে,—
বারো মাসের একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

অনুশীলনী

১। খেয়া-ডিঙির মাঝির জীবন বর্ণনা কর।

২। খেয়া-ডিঙির মাঝি খেয়া পার করিবার সময় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পায়?

৩। "দিনেরাতে কত লোকের কত কথাই শুনি।"—কে এই কথা বলিয়াছে? সে কোন্ অবস্থায় মানুষের নানা কথা শুনিতে পায়?

৪। "বারোমাসের একটি দিনও ছুটি কামাই নাই।" কোন কবিতা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মর্মার্থ লিখ।

৫। মৌখিক উত্তর দাও:

ক) ভাদ্রমাসে নদীর অবস্থা কিরূপ হয়? খ) নদীতে বান আসিলে মাঝি কি করে? গ) মাঝির একটি দিনও ছুটি নাই কেন ঘ) মাঝি কোন্ জিনিস এপার ওপার করে?

৬। বাক্যরচনা কর: পাথর, একূশা, গলা-নাগাল, ঝমঝমিয়ে, আঁটিবাঁধা।

—

মানুষের অমিনতি মানুষের জীবনকাহিনী

বাংলা দেশ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ছন্দের যাদুকর। তাঁহার এই কবিতায় বাংলা দেশের গুণকীর্তন করা হইয়াছে। কবিতাটি ছড়ার ছন্দে রচিত।]

কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'ল্তে গেলেই–দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল—সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা ফিঙ্গে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে– চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে।

কোন্ ভাষা মরমে পশি,–আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা, সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের চরণধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।

২। বাংলাদেশের কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা কবি বলিয়াছেন ?

৩। "কোন্ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে উঠে মোদের বুক।"

— কোন্ দেশের কথা বলা হইয়াছে ? সে দেশের গৌরবের পরিচয় দাও।

৪। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

"মোদের পিতৃপিতামহের······আমাদেরি বাংলা রে।"

— কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূল ভাব কি ?

৫। বাক্যাংশের আলোচনামূলক প্রশ্ন :

(ক) "বাউল সুরে মধুর গান"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? বাউল কি ?

খ) "চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? চণ্ডীদাস কে ? রামপ্রসাদই বা কে ?



অখিল মাঝি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক পল্লী কবি। এই কবিতায় তিনি একটি মাঝির মুখ দিয়া পল্লীজীবনের একটি সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।]

অজয়ের বুকে সারাদিন   সারাদিন তরী বাহে
সন্ধ্যাবেলায় আঙিনায়   জাল বোনে আর গাহে—
সুখে আছি আমি হরি হে   অভাবের আমি ডরিনে,
আমারে হিংসা করোনাক কেউ কারেও হিংসা করিনে।
চাঁদ উঠে দেখে আগে সে   সম্ভাষে আগে র'ব।
কোকিলের গানে জাগে সে   গভীর শান্তি লভি'।
ধরে পাড়ি আর গাহে গান   ধারিনে, কাহারো হরি নে,
কাহারো মন্দে থাকিনাক আমি কারেও হিংসে করিনে।
যবে মন্দিরে বাজে শাঁখ   সাঁজের আঁধার জমে,
দাঁড় থামায় সে ক্ষণকাল   হরির চরণে নমে।
শরীরে তাহার নাহি রোগ   দেহে লাগে বটে কাদা,
বনটগরের মত তার   হৃদিখানি রয় সাদা।
একদা গাঁয়ের জমিদার   ক'ন তরী হ'তে নামি
দুনিয়ার মাঝে একা তোরে   হিংসা করি রে আমি।
জমিদারী দিয়ে ডিঙিখান   নিতে আমি আছি রাজি
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ   পাই যদি ওরে মাঝি।

অনুশীলনী

১। অখিল মাঝি কোথায় নৌকা চালায়? তাহার জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?
২। অখিল মাঝিকে কেন জমিদার হিংসা করিতেন?
৩। "জমিদারী দিয়ে ডিঙিখান……… যদি ওরে মাঝি।"
—কোন্ কবিতা হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে কে এই কথা বলিয়াছেন? ইহার মূল অর্থ কি?

কান্তি-স্নিগ্ধ সন্তোষময় পল্লীচিত্র

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[যতীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিগণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহার কবিতার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি, বাংলাকাব্যে নূতনত্ব আনিয়াছে। এখানে কবি ভাঙা-হাটের একটি বিষদকরুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।]

দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি,
মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়,
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামেজ্বলে ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট
নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে নিশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান ;
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনা ভিড়ে।
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি ;
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা অচেনার ভিড়ে।

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় হাটের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

(ক) "নিশা নামে দূরে ……পাকুড় শাখে।"
—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ?

(খ) "হাটের দোচালা……কাকের ডাকে।"
—ইহা কোন্ কবিতার অংশ ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূল অর্থ কি ?

(গ) "হানাহানি করে……গেল খালি ফিরে।"
—কোন্ কবিতায় এই পংক্তিটি রহিয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূলভাবটি লিখ।

৩। মৌখিক উত্তর দাও :

(ক) সন্ধ্যাবেলায় হাটের দৃশ্য কিরূপ হয় ?

(খ) দিনের বেলায় হাটের অবস্থা কিরূপ থাকে ?

৪। বাক্যরচনা কর : বেচাকেনা, চেনা-অচেনা, চেনাচিনি, জানাজানি, কানাকড়ি, টানাটানি, হানাহানি।

৫। অর্থ লিখ : নিশা, শ্রেণীহারা, মুদিল, বিদ্রূপ, জীর্ণ, ছিন্ন, চরণ।

হাতেমের দর্প চূর্ণ

কবিশেখর কালিদাস রায়

[এই কবিতায় কবি হাতেমের দর্প কী ভাবে চূর্ণ হইয়াছিল, তাহা হাতেমের জীবনের একটি ঘটনায় বর্ণনা করিয়াছেন ।]

স্তাবকেরা মিলি করিতেছে সবে হাতেমের গুণগান,
কহিল হাতেম—থাম থাম সবে ঝালাপালা হ'ল কান ।
এই শহরের প্রান্তে রয়েছে মোর চেয়ে ঢের বড়
একজন লোক যদিও কাঙাল, তারই গুণগান কর ।
চল্লিশ উট কোরবানী করি করেছিনু আয়োজন
মস্ত ভোজের, অবারিত দ্বার, সবার নিমন্ত্রণ ;
আমার বাড়িতে জুটিল সবাই, করিলাম অনুভব
তৃপ্তি সুখের সঙ্গে সেদিন অপূর্ব গৌরব ।
আসিতেছিলাম উষ্ট্রে চড়িয়া বনের প্রান্ত দিয়া,
দেখিলাম এক কাঙাল বৃদ্ধ কাঠকুঠা কুড়াইয়া
জড়ো করিতেছে এক জায়গায় । বলিলাম তারে ডাকি,
হাতেমের বাড়ী বড় খানা আজ, তুমি তাহা জান নাকি ?
সবাই গিয়াছে, তুমি যাবে নাক সেথা আজ নওরোজ,
চল্লিশ উট কোরবানী সেথা জমেছে বিরাট ভোজ ।
সে কহিল শুধু—খাটিয়া যে পারে জুটাতে পেটের ভাত
তার কি অভাব ? হাতেমের দ্বারে কেন সে পাতিবে হাত ?
তার কথা শুনে হইল আমার গর্বের অবসান,
গুণগান যদি করিতে হয়, কর তারই গুণগান ।

অনুশীলনী

১। হাতেম কে ছিলেন ? কাহারা তাঁহার গুণগান করিতেছিল ? হাতেম তাহাদের কী বলিয়াছিলেন ?

শ্রমের মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার আনন্দ

২। হাতেমের বাড়ীতে সকলে মিলিত হইয়াছিল কেন? তিনি গৌরব অনুভব করিলেন কেন? বনের প্রান্তে তিনি কাহাকে কী অবস্থায় দেখিয়াছিলেন?

৩। "হাতেমের বাড়ী বড় খানা আজ"

—কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কী বলিয়াছিল?

৪। "খাটিয়া যে পারে জুটাতে পেটের ভাত তার কি অভাব?"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? ইহার মুল ভাব কি?

৫। অর্থ লিখ কোরবানী, ভোজ, নওরাজ।



দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে

কাজী নজরুল ইসলাম

(নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি নামে খ্যাত। এই কবিতায় তিনি শিশু মনের দুরন্ত আবেগ বর্ণনা করিয়াছেন।)

থাকব নাক বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন করে' মরছে বা বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কেমন কার' বীর ডুবুরি সিন্ধু সেচে মূক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে।

জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ জাহাজ চল্‌ছে ছুটি
কেমন করে আনছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধুযানে,
কেমন জোরে মথ্‌লে সাগর উথলে উটে জোয়ার বানে।
কেমন করে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চল্‌ছে হিমালয়ের চূড়ে
তুহিন-মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আসায় ?
হাউই চড়ে' চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরে,
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্ 'মঙ্গল' হ'তে আসছে উড়ে !
রইব নাক বদ্ধ খাঁচায় দেখ্‌ব এ সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্রতারায় সাগর জলে পাহাড়চূড়ে !
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশ দিকেতে পড়্‌বে লুটে
পাতাল ফেড়ে নামব নীচে উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে !
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতে মুঠোর পুরে'।

অনুশীলনী

১। কোথায় কোথায় শিশু অভিযান করিতে অভিলাষ করিতেছে ?

২। "থাকবোনাকো বদ্ধ ঘরে।"

—কে বদ্ধ ঘরে থাকিতে চাহে না ? সে বাহিরে কোন্ কোন্ জিনিস জানিতে চাহে ?

৩। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

"হাউই চড়ে চায় যেতে কে" হতে আসছে উড়ে !"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূল ভাব কি ?

৪। অর্থ লিখ : সিন্ধুযান, মথলে, পাথার, তুহিন, অচিন, ভুবন ?

ডুঃসাহসের জেটী

স্বদেশ

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

[রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রতিভাবান কবি। মাত্র একুশ বছর বয়সে কবির মৃত্যু ঘটে। ছাড়পত্র, ঘুম নেই তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।]

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এ মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাঠি,
সহস্র বছর ধরে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।
যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশের ধুলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভুলি?
আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়,
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।
তবুও অজেয় এই শতাব্দী গ্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।

অনুশীলনী

১। "জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা।"
—কোন্ দেশের কথা বলা হইয়াছে ? সে দেশের ঐতিহ্যের পরিচয় দাও।

২। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

(ক) "এখানে রক্তের দাগ....... কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।"

কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূল অর্থ কি ?

(গ) "আজন্ম দেখেছি আমি.........ভারতবর্ষকে।"

কোন্ করিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? ইহার মূল অর্থ কি ?

৩। বাক্যাংশের আলোচনামূলক প্রশ্ন :

(ক) "এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস তৈমুর।"

কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? চেঙ্গিস ও তৈমুরের পরিচয় দাও।

(খ) "সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।"

—কোন্ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে ? উচ্চৈঃশ্রবা সম্বন্ধে কি জান ?

৪। অর্থ লিখ : ঐতিহ্য, সমাচ্ছন্ন, দিগ্বিজয়ী, গ্রথিত, শতাব্দী।

শেষ

স্বদেশপ্রীতি ও গর্বচেতনা